সাবালিকা কর্তৃক নাবালক অপহরণ

ইত্যাদি

একডজন কাহিনী ফাঁস করেছেন

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

লেখক
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক
শ্রীগণদেব মল্লিক
ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং
৬০, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

একমাত্র পরিবেশক
গ্রন্থ বিকাশ
২২/১ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীসুশীল দাস
মুনলাইট, কালী পার্ক
আর গোপালপুর ২৪ পরগণা।

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭১

প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যে নিছক ব্যঙ্গ কৌতুক রচনার ক্ষেত্র অতি সীমিত। এখানে যাঁরা গুরু-গম্ভীর রচনায় দক্ষ তাঁরাই পণ্ডিত সমাজে শ্রদ্ধেয়; কিন্তু যাঁরা জীবনের সহস্র বিরসতাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সরস ক'রে তোলেন তাঁরা নিছক ভাঁড় বলে পরিচিত। তাই এই দিকে খুব কম লেখকই এগিয়ে আসেন। তবে বাংলা সাহিত্যের বড় বড় দিক্‌পালরাও কৌতুক রসকে অবজ্ঞা করেননি, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী লেখকদের লেখায় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যুগেও কয়েকজন লেখক শুধু ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনা ক'রে অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।

পুরাণজ্ঞ লেখকরূপে খ্যাত শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ও বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য 'সাবালিকা কর্ত্তৃক নাবালক অপহরণ' ইত্যাদি গল্পগুলি লিখে আমাদের বর্ত্তমান দুঃসহ জীবনের ভার অপনোদনের জন্য যে প্রচেষ্টা করেছেন, তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর অতুলনীয় পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির ভাব গাম্ভীর্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে এই অতি সাধারণ গল্পগুলিতে যে কৌতুকের সন্ধান দিয়েছেন, তাতে তিনি যে একজন রসিক ব্যক্তি, তা বুঝতে কষ্ট হয়না। যাঁরা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের পরিবেশ ছেড়ে হাসি কৌতুকের একটু খোলা-হাওয়ায় এসে হাঁফ ছাড়তে চান, তাঁরা এই গল্পগুলি পড়লে আনন্দ পাবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

এতে যেসব আজেবাজে গল্প আছে—

সাবালিকা কর্তৃক নাবালক অপহরণ

কিছুদিন আগে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটা ব্যঙ্গরসাত্মক ছবি দেখেছিলুম। ছবিটির শিরোনাম—'অতীত ও বর্তমান'। ছবির একপাশে অতীতের দৃশ্যে কোমরে কাপড় জড়ানো পল্লীনায়ক তাঁর ব্রীড়াবনতা প্রেমোন্মুখী প্রেয়সীকে তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন। ছবির আর এক পাশে যেখানে বর্তমানের দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে, সেখানে অতি আধুনিকা এক শহুরে নায়িকা তাঁর সামনে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা প্রেমিককে বলছেন, 'চট্ পট্ সেজেগুজে নাও। এখনই আমরা ভিজাগোপট্টমে চম্পট দোবো। সেখানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। সাবধান। কারু কাছে যেন আবার ফাঁস করে দিও না।'

বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগে পুরুষের এ হেন পিছিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা আমার কাছে বিষসদৃশ লেগেছিল। রাতারাতি সব ব্যাটাছেলেগুলো মেয়েমানুষ হয়ে যাবে,—নিজে ব্যাটাছেলে হয়ে এ কথাটা ভাবতে পারা কি খুব সুখের ? মনে মনে ঐ ছবির শিল্পীকে ধিক্কার দিয়েছিলুম কিনা মনে পড়ে না, তবে পত্রিকা থেকে ঐ ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তবে সেটিকে গৃহপ্রবেশ করিয়েছি, মনে আছে। কারণ সাতঘরের ভাড়াটে বাড়ীতে বাস ক'রে সবাই যখন গায়ের জোরে বা গলার জোরে এগিয়ে এসে আমার আগেই 'বাথরুম' বা 'প্রিভি' দখল করে নেয়, এবং আমি কাছাখোলা অবস্থায় 'প্রিভি কাউন্সিলে'র গেটের সামনের ল্যাম্পপোষ্টের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি, তখন মাঝে মাঝে এমনিতেই আমার গিন্নী আমার পুরুষত্ব সম্বন্ধে

সন্দেহজনক এবং কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য ছুঁড়ে মারেন। এ হেন ক্ষেত্রে ঐ ছবি তাঁর চোখে পড়লে আর রক্ষে ছিলো? ঐ ছবিসহ পত্রিকাটিকে বাড়ীতে আনাও যা, খাল কেটে কুমির ডেকে আনাও কি তাই ছিল না?

কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ছিঁড়ে কি আর এসব ব্যাপার থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ? খবরের কাগজগুলোর মুখ বন্ধ করব, এমন সাধ্য কই? বিশেষ যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কোন কোন ক্ষেত্রে ধিক্কৃত হলেও সর্বক্ষেত্রেই আইনের দ্বারা স্বীকৃত। খবরের কাগজে আবার ঐ সব মেয়েঘটিত খবরগুলো সামনের পাতাতেই থাকে! সুতরাং কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে যাওয়া মাত্রই ফর্ ফর্ ক'রে সামনের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলতে পারে, এমন বুকের পাটা যখন কোন পাঁঠা-মার্কা পুরুষেরও থাকা সম্ভব নয়, তখন আমার মতো এক নিতান্ত পুরুষ (মতান্তরে কাপুরুষ এবং গিন্নীর ভাষায় না-পুরুষ) কেমন ক'রে তা ধারণ করতে পারবে? সুতরাং প্রায়ই ষ্টোভ জ্বালাতে জ্বালাতে যখন তাঁর ফুৎকারধ্বনি কানে এসে লাগে, তখন চুপ ক'রে চা-কর বৃত্তিতেই মনঃসংযোগ ক'রে থাকতে হয়। খবরের কাগজে চোখ রেখেই আপন মনে তিনি ব'লে চলেন—'রোষ্টিশৃঙ্গ বিজয়িনীদের রাষ্ট্রীয় সম্মান...... বিশ্ববিত্মালয়ের বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারিণী অমুকা অমুকা অমুকা......ইত্যাদি।' কিছু বলি না। অমুকাদের কৃতিত্বের কাছে আমার এ পোড়া-মুখ আর খুলতে ইচ্ছা যায় না। প্রতিদিনই নিঃশব্দে (তাঁর কাগজ পড়ায় বিঘ্ন হবার ভয়ে) দু-কাপ চা বানিয়ে নিয়ে (এক কাপ তাঁকে এগিয়ে দিয়ে) নিজের কাপে নিজে চুমুক দি'।

জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নারীরা বিজয়িনী হচ্ছেন, এটা আমার হিংসুটে মনে যতই ক্রিয়া করুক না কেন, কথাটা একটুও মিথ্যা নয়। কিন্তু তাই ব'লে মেয়েরা যে ছেলে হয়ে যাবে, আর ছেলেরা মেয়ে, এ কথাই বা বিশ্বাস করি কোন্ যুক্তিতে? এখনও তো

ছেলেরাই মেয়েদের বিয়ে করে এবং ছেলেরাই তো মেয়েদের নিয়ে পালায়! যতদূর জানি, আমাদের মধ্যে বউ-এর পদবী গ্রহণের প্রথা কি আছে? ছেলেকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'তুমি কার ছেলে?' তাহলে কি সে বলবে, 'আমি হেমঙ্গলতা চৌধুরাণীর ছেলে'? লোকে কি বীরপুঙ্গবদের 'মা-কা-বেটা' ব'লে বাহবা জানায়? তবে?

কিন্তু আমার সেই 'তবে' ও যে হাতেনাতে একদিন গিন্নীর দলের 'তাঁবে' চলে যাবে, এ কথাটা ভাবিনি। এবার সেই ঘটনাই বলি।

তাঁর মুখেই অবশ্য প্রথম শুনেছিলুম খবরটা। ভাষাটা অবশ্য তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যবহির্ভূত ছিল না। বলেছিলেন:

—'হরিশঙ্করবাবুর মেয়ে পরাশরবাবুর ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে, শুনেছো?'

শুনিনি। তবু গিন্নীর ঐ 'নিয়ে পালিয়েছে' কথাটা কানে এসে বিঁধলো। এর প্রতিবাদে কিছু একটা বলা উচিত বিবেচনা করেই বলে উঠেছিলুম:

—'হ্যাঁ শুনেছি। গদাধর রিন্টিকে নিয়ে পালাবে, এ আমি জানতুম। প্রায়ই দেখতুম রিন্টি গদাধরের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে।'

—'তুমি ছাই জানতে!' ব'লে উঠেছিলেন গিন্নী। 'গদাধর রিন্টিকে নিয়ে নয়, রিন্টিই গদাধরকে নিয়ে পালিয়েছে। রিন্টিই গদাধরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত এখানে সেখানে।'

অন্যদিন হ'লে চেপে যেতুম। কিন্তু সেদিন কি জানি কেন, রাজনৈতিক নেতাদের মতই সোচ্চার হয়ে উঠতে চাইছিল আমার কণ্ঠ। কিছুতেই বাগ মানাতে না পেরে বর্তমানকে ডিঙিয়ে ইতিহাসেই ডিঙি মারি—

—'জানো, মেয়েদের অত ক্ষমতা নেই! অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে স্ত্রীর গলায় দড়ি বেঁধে কেউ কেউ বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত, জানো? তখন একটা ঘোড়া হারিয়ে গেলে লোক সন্ধানদাতাকে

পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিত, অথচ স্ত্রী হারালে পাঁচ শিলিং, খবর রাখো? তাছাড়া এগারো হাত কাপড়েও যারা কাছা দিতে পারে না, ত তারা আবার ছেলেকে নিয়ে পালাবে। হুঁঃ।'

ভেবেছিলুম আমার এই হঠাৎ পুরুষত্বে গিন্নী ঘাবড়ে যাবেন। কিন্তু আমাকে ঘাবড়িয়ে ঘাবড়িয়ে তাঁর নিজে না-ঘাবড়ানির এমন এক অত্যাশ্চর্য 'পাওয়ার' জন্মে গেছে যে, কিছুতেই আর টলেন না তিনি। বলেছিলেন :

—'হ্যাঁ, সে ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। আর দুটো শতাব্দী বাদে বত্রিশ বছর বয়সেও যাদের দুধে-দাঁত উঠবে না, পঁচিশ বছর বয়সেও যারা হামাগুড়ি দেবে, তাদের মুরোদ আমার আরও বেশী জানা আছে!'

গিন্নীকে অতীত শুনিয়ে নিজেকে তর্কাতীত করতে চেয়েছিলুম। উনি আমায় ভবিষ্যৎ দেখিয়ে চোখ অন্ধকার ক'রে দিতে চাইলেন।

'কেন?' পুনরায় তাই প্রতিবাদ ক'রে উঠেছিলুম আমি। ইতিহাস ছেড়ে এবার বাস্তব লজিকে ফিরে আসতে হলো, 'এখনও তো ছেলেরাই মেয়েদের নিয়ে পালায়, মেয়েরাই তো ছেলেদের সঙ্গে ঘোরে। তোমার বেলায় বুঝি তার সবই উল্টো? বলি, আমি তোমায় বিয়ে করেছি, না তুমি আমায় বিয়ে ক'রে এসেছ? বিয়ের আগে আমার বাবা তোমার বাবার হাত ধরে অনুনয়-বিনয় করেছিল, না তোমার বাবা এসেছিল আমার বাবার কাছে?

কিন্তু আশ্চর্য! এতগুলো বাপ-বাপান্ত করেও তাঁকে ঘাবড়ে দিতে পারলাম না। আমার এ হেন মারাত্মক অসমসাহসিকতায় পৃথিবীর সকল আশ্চর্যকেও হার মানিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠলেন না গিন্নী। শুধু মুচ্‌কি হেসে বলেছিলেন :

—'বুঝবে।'

বুঝেছিলুম। কিন্তু সে একটু পরে।

এর মধ্যে একদিন পরাশরবাবুর সঙ্গে দেখা। ওঁর ছেলে-ঘটিত ব্যাপার ওঁকেই জিজ্ঞেস করব, এমন আহাম্মক আমি নই। উনি নিজেই আমায় বললেন ঃ

—'হরিশঙ্করবাবুর কীর্তির কথা শুনেছেন ?'

মনে মনে একটু প্রমাদ গণেছিলুম। এসব কীর্তি স্বয়ং বাপেদের হয় না বলেই জানি। তাই মেয়েকে ছেড়ে বাপের কীর্তি ধরে টানাটানিটা ভাল ব'লে মনে হলো না।

অবশ্য গদাধর ও রিন্টি বর্তমানে স্বতন্ত্র এক ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে বিবাহিত জীবন শুরু ক'রে দেওয়ায় হরিশঙ্করবাবুর সঙ্গে পরাশরবাবুর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এমন একটা সম্পর্ক আইনত ও ধর্মত গজিয়ে উঠেছে, যার ফলে একে অপরের কীর্তি ধরে টানাটানি করতে অবশ্যই পারেন। পরাশরবাবুও বোধ হয় সেই অধিকারটাই প্রয়োগ করতে চাইছেন এক্ষেত্রে। কিন্তু এসব অধিকারের ব্যাপার দুই বেয়াই বা বেয়ানের মধ্যেই সীমিত থাকা উচিত। আমার মতো একজন বৈবাহিকহীন ব্যক্তির কাছে বেয়াইয়ের নিজের কীর্তিটা কেন ফাঁস করতে চাইছেন পরাশরবাবু, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তাই বলি ঃ

—'না তো। কি ব্যাপার ?'

—'দেখুন, একেই তো আমার ঐ পাজি হতচ্ছাড়া ছেলেটা ওর ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করেই আমার কত টাকা ক্ষতি ক'রে দিল, তার ওপরে আবার নাকি 'কেস' ফাইল ক'রে দিয়েছে।

—'কেস! কিসের কেস ?' কেসের কথা শুনে অনেকের কাশি ধরে যায়, আমার আবার রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়াতে ইচ্ছে করে।

—'আরে মশাই, নাবালিকা অপহরণের কেস। আমার ছেলে নাকি ওর নাবালিকা কন্যাকে ফুসলে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। কি তাজ্জব ব্যাপার বলুন তো ?'

তাজ্জব ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপর বেশী কথা বলবার

মতো ভাষার খেই আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। আমার গিন্নীর মতো কথার খই ফোটাবার বৈষ্ণবী-শক্তি কোনদিনই আমার আয়ত্তাধীনে ছিল না।

বিশেষ, এ ক্ষেত্রে কথা বলা আরও বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে মধ্যম পুরুষের বিরুদ্ধে (এসব ব্যাপারে যাকে 'অধম পুরুষ'-ও বলা হয়ে থাকে) সাক্ষ্য দেবার আহ্বান আসতে পারে ব'লে অনুমান করছিলুম। আর এ জাতীয় অপহরণের মামলায় সাক্ষী হতে হলে আমার উত্তম পুরুষের উত্তমতাও অপহৃত হয়ে যাওয়া যে অনিবার্য, সে কথাও টের পাচ্ছিলুম। অনেক ক্ষেত্রে ঐ অধম পুরুষের হাতে উত্তম-মধ্যম পেয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ঠিক সময়েই পেটটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে পরাশরবাবুর অনুমতি বাক্য উচ্চারিত হওয়ার আগেই কাছায় হাত রেখে বাড়ির দিকে ছুটেছিলুম।

জানি, পরাশরবাবু এর জন্য হয়তো 'কাছাখোলা ব্যাটাছেলে' ব'লে আমার নাম ছড়িয়ে দেবার 'পাবলিসিটি এজেন্ট'-রূপে আবির্ভূত হতে পারতেন ভবিষ্যতে। কিন্তু সে ভয় কি আর তখন ছিল আমার? এই সব মুহূর্তে যে লোকে বাঘকেও ভয় খায় না, সে কথা তো আপনিও জানেন!

গিন্নীর সেই 'বুঝবে' বাক্যের ব্যাখ্যা এক অভিনব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বুঝেছিলুম অবশেষে।

সেদিন অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছিলুম। কিন্তু বাড়ীতে এসে দেখলুম, তিনি নেই।

সদ্যোবিবাহিত অনেক নাবালক অবশ্য এ রকম গিন্নীশূন্য গৃহ দেখে বুকে রাবণের শেলাঘাত অনুভব করেন। কিন্তু অনেক শেল খেয়ে খেয়ে আমার বুকের সব 'শেল'-এর শক্তিই তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। বরং একটু আশ্বস্তই হয়েছিলুম স্বীকার করি।

ক্যাবলা এক মনে তার 'চুজ্ প্যাণ্ট' ঝাড়ছিল। ওর কাছেই শুনলুম্, তিনি পরাশরবাবুদের বাড়ী নেমন্তন্ন গেছেন।

—'নেমন্তন্ন ? কিসের নেমন্তন্ন ?'

ক্যাবলা যেন এবার আকাশ থেকে নেমে আসা শত্রুপক্ষীয় হানাদারের মতো একেবারে দাবাদারটি বনে গেল। যেন সে নিজের নামটি ছাড়া বাপের নামসহ বিশ্বের আর কিছুই জানত না। তাই সে উত্তরও দিতে পারল না কিছু। শুধু মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল।

উত্তর এলো ঘরের বাইরে থেকে :

—'মামলায় পরাশরবাবুর জিৎ হয়েছে। তাই ওঁর স্ত্রী, মানে আমার বকুলফুল, আমায় নেমন্তন্ন করেছিলেন। খাইয়াছে কিন্তু বেশ!

—'মামলায় জিৎ!'

বিস্ময়ে আমার প্রায় চিৎ হবার উপক্রম! পরাশরবাবুর মামলায় জিৎ হওয়াটা আমার কাছে মামুলি ব্যাপার ব'লে মনে হলো না।

এবার ঘরে ঢুকে রহস্যময় কণ্ঠে বললেন আমার চিররহস্যাবৃতময়ী গিন্নী :

—'হ্যাঁ। পরাশরবাবুর নামে হরিশঙ্করবাবু যে মামলা দায়ের করেছিলেন, তাতে তিনি নিজেই হেরে গেছেন। জজ সাহেব রায় দিয়েছেন যে, এ ক্ষেত্রে নাবালক গদাধরকেই অপহরণ ক'রে নিয়ে বিবাহসূত্রে তাকে আবদ্ধ করেছে ঐ সাবালিকা রিন্টি।'

—'সে আবার কি!'

আমার তো দম বন্ধ হবার জো। এখন বুঝতে পারছি, লোকে 'রেশন কার্ড' দেখে বাপের নাম স্মরণ করার কথাটা বলে কেন!

গিন্নী কোন উত্তর দিলেন না, উত্তর দিল আমার ত্রয়োদশবর্ষীয় একমাত্র গুণধর। বলা বাহুল্য, দন্ত্য স এর আধিক্য থাকলেও তার কথাগুলো বুঝতে আমার আর একটুও কষ্ট হয় না। ব'লে উঠলো ক্যাবলাচরণ :

—'সে তো খুবই সোজা ফ্যাক্ট, বাওয়া। রিন্টিদির ইস্কুল ফাইনাল

সার্টিফিকেট ওর জন্মাবার ইয়ার লেখা আছে নাইনটিন ফোরটী এইট, আর গদাদার ফোরটী নাইন। জজ মহারাজও তাই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে এক বছর বয়সে বেশী এক সাবালিকা মেয়ে তার চেয়ে এক বছরের জুনিয়ার ছেলেকে ফুসলে নিয়ে লোপাট্টা হয়ে গেছে। হরিদাদু একেবারে কুপোকাৎ। বুয়েছে?'

সবই বুঝলুম। কিন্তু রিন্টিদির বাবা ওর কোন্ সম্পর্কে দাদু হলো, বুঝলুম না। কটমট ক'রে তাই আমার চির-গোবেচারী ক্যাবলার দিকে তাকিয়েছিলুম।

কিন্তু তার জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে সে জিজ্ঞেস ক'রে বসলো আমায়:

—'আচ্ছা বাওয়া, মেয়েরা কত বছর বয়সে 'এ্যাডাল্ট' হয় বলো তো?'

রাগে তখন আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল। এই আক্কেল খেকো ভেঁপো রাস্কেলটাই কিছুক্ষণ আগে 'মা কেন নেমন্তন্ন খেতে গেছেন' তা-ও জানত না। অথচ এখন জজের রায়টাও মুখস্ত ব'লে গিয়ে আবার মেয়েদের বয়স নিয়ে মনে মনে 'কালচার' শুরু ক'রে দিয়েছে। ব্যাটার মস্তিষ্কটাই একটা 'এগ্রিকালচার'-এর ঘাঁটি হয়ে উঠেছে দেখছি।

কিন্তু দেখলুম, আমি তার দিকে যত কটমট ক'রে তাকিয়েছিলুম, তার চেয়েও অনেক বেশী জ্বালাময়ী কটমটানিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন আমার অর্ধাঙ্গিনী।

সেদিন ওদের মা-বেটাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।

পরের দিন বাজারে যাবার পথে হরিশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা হতে লজ্জার মাথা খেয়ে ওঁকেই ব'লে ফেললাম:

'হ্যাঁ মশাই, একি উদ্ভট ব্যাপার শুনছি? আপনার মেয়ে তো গদাধরের চেয়ে প্রায় বছর পাঁচেকের ছোট ব'লেই জানতুম। তবে?'

প্রশ্নটা যে আমার আদৌ ঠিক হয়নি, সেটা বুঝতে পারলুম পরক্ষণেই। উনি বোধ হয় প্রথমটায় আমার স্বরে আমাকে আমি ব'লে ঠিক চিনতে পারেননি। তাই চিড়িয়াখানায় মুখব্যাদানরত জলহস্তীর 'পোজ্' নিয়ে বিরাট বপুসহ ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। এবং আমায় স্বশরীরে দেখে চিনতে পেরে একটু যেন কমে এলো তাঁর সেই সুবিশাল মুখবিবরের ডায়োমিটার।

একটা দীর্ঘশ্বাস তিনি নিলেন কি ফেললেন, বুঝতে পারলুম না। শুধু হুস হুস ক'রে একটা বায়ু সঞ্চালনের শব্দ শ্রুত হলো আমার কর্ণে। তিনি বললেন :

—'আরে মশাই, যত নষ্টের গোড়া তো ঐ আমার গিন্নী। স্কুল ফাইনালের ফরম ফিল-আপ করবার সময় উনিই তো আমায় বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, মেয়ের যেরকম বাড়ন্ত গড়ন, তাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হলে দু'বছর বয়স বাড়িয়ে না দিলেই নয়। বলে কিনা, কচি মেয়েকে নাকি বিয়েই করতে চায় না আর আজকালকার ছোকরারা। আর ঐ পরাশরবাবু, মানে আমার বেয়াই, দেখুন, ছেলে ভবিষ্যতে যদি কোনদিন গভর্ণমেণ্টের চাকরি করে,—এই আশায় বেমালুম তিন তিনটে বছর ছেলের বয়স থেকে ছেঁটে উড়িয়ে দিয়ে আমায় দ-য়ে মজিয়ে দিল।'

অন্য কেউ হলে হয়ত এরপর আর কথা বাড়াত না। কিন্তু হরিশঙ্করবাবুর মুখে তাঁর গিন্নী-বিরোধী উক্তি আমায় এমনই মোহিত ক'রে দিয়েছিল যে, যেন ওঁর সঙ্গে কথা বলবার লোভেই জিজ্ঞেস করে বসলুম :

—'দ-য়ে মজালো মানে? সেটা আবার কি রকম মজা?'

—'আরে তাও জানেন না? আমি কি এমনি এমনি 'কেস' করেছিলুম?'—ব'লে চললেন হরিশঙ্করবাবু :

—'রিন্টি আর গদাধরবাবাজী বিয়ে করেছে, সংসার পেতেছে, তা

কি আর আমার মনঃপূত নয় ভেবেছেন ? আমি তো 'কেস' করেছিলুম ঐ বেয়াই হতচ্ছাড়াটার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য।'

—'কেন ? উনি আবার কি করেছেন ?'—প্রশ্ন করি।

—'কি করেননি, তাই বলুন ?' হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন হরিশঙ্করবাবু :

—'যেদিন ওরা বিয়ে করলো, তার পরের দিন থেকেই তো ও আমার কাছে এসে বায়না ধরলে,—হরিবাবু, 'লাভ' করে ওরা বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে আমি কিন্তু আমার লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি না। আমার পাওনাটুকু কিন্তু আমার চাই-ই। জানেন মশাই, ও আমার কাছ থেকে দু' হাজার টাকা নগদ আর পঁচিশ ভরি সোনার গয়না ক্লেম করেছিল ?'

রিন্টি আর গদাধরের 'লাভ'-এ পরাশরবাবু লোকসান খেতে নারাজ। মেয়ে প্রেম করার আগেই বাপ্‌কে তাহলে টাকা 'রেডি' রাখতে হবে এবার ?

—'এবার তাহলে কি করবেন ?'—না জিজ্ঞেস ক'রে পারি না।

উথলে ওঠা ফুটন্ত দুধে এক ঘটি জল ঢেলে দিলে যেমন হয়, আমার উৎসাহের বাক্যে হরিহরবাবুর অবস্থাও হলো ঠিক তেমনি। অতি মৃদুস্বরে যেন স্বগতোক্তিই করলেন তিনি এবার :

—'কি আর করব বলুন ? দিতে হবে। তাই ব'লে নাবালক অপহরণের পাল্টা দায়ে তো আর জড়াতে দিতে পারি না সাবালিকা মেয়েটাকে ?'

গিন্নীর কাছে এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করিনি আমি আর। মনকে শুধু এই বলেই প্রবোধ দিয়েছিলুম যে, নিজের পেটের ছেলেকেই যারা দশ মাসের বেশী পেটে ধরে রাখতে পারে না, তাদের কাছে কোন কথা না বলাই ভালো। যে কোন মুহূর্তে যে কোন বেফাঁস কথা ফাঁস করে দিতে পারে তারা।

বাপ্ হওয়ার পাপ

আমার একমাত্র ছেলে ক্যাবলাচরণ যে কোন্ ক্যাবলাকান্ত ঠাকুরের দোর ধরে জন্মেছিল, তা আমি জানি না ; কিন্তু আমার মা, মানে ক্যাবলার ঠাকুমা, তার এই নামকরণই করেছিলেন। নামটা আমার অবশ্য মনঃপূত হয়নি, কিন্তু আমার মা তাঁর একমাত্র নাতিকে আদর করে এই নাম দিয়েছেন দেখে আর আপত্তি করতে পারিনি। ক্যাবলার মা অবশ্য কয়েকদিন গজগজ করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সেই গজগজানির গতি স্বাভাবিকভাবেই মন্থর হয়ে এসেছিল। তবে, তার আগেই মাতৃ-সংস্কারে আমার ক্যাবলাচরণ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল 'কেবু'তে। বলা বাহুল্য এই সংস্কারে তার ঠাকুমারও সানন্দ স্বীকৃতি ছিল।

প্রথমেই বলেছি, ক্যাবলার ক্যাবলাচরণ নামকরণটা আমার তখন মনঃপূত হয়নি ; কিন্তু এখন বুঝছি যে, ঐ একটি মাত্র নাম ছাড়া আমার শ্রীমানের পক্ষে আর কোন নামই উপযুক্ত ছিল না। আমার জননীর এ হেন দূরদৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাই।

অফিসে তিন দিন যাবৎ ধর্মঘট চলছিল। সুতরাং বাড়িতে বসে রবীন্দ্রসাহিত্যে মগ্ন হয়ে ছিলাম। পড়ছিলাম 'গান্ধারীর আবেদন'। পুত্রস্নেহকাতর অসহায় অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপগুলো আবৃত্তি করছিলাম আবেগভরে—

হায় বৎস, অভিমানী ! পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হ'ত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ । করিতেছি সর্বনাশ তোর,—

এমন সময় হাসতে হাসতেই ক্যাবলাচরণ তার পরীক্ষার গুণলিপি এনে দিল আমাব হাতে । গুণলিপি, অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফল লেখা কাগজটার দিকে তাকিয়ে আমার তো চক্ষুস্থির ! ফল কোথায়, এ যে সবই অফল ! একে বরং বিফল কিংবা কুফলও বলা যেতে পারে ।

ক্যাবলার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাদের হেডমাষ্টারমশাই বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছেন যে, শ্রীমান ক্যাবলাচরণ মুখোপাধ্যায় এই বছরেও অঙ্কে পাঁচ, ইংরেজীতে সাত, বাংলায় ছয়, ইতিহাসে বারো, ভুগোলে নয়, এবং স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানে যথাক্রমে আট ও এগারো পেয়েছে । অভিভাবকের সুবিধার জন্য প্রধানশিক্ষক মশাই একথাও জানিয়েছেন যে, উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়েরই পূর্ণ সংখ্যা একশো । অতএব ওকে এই স্কুল থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করলে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন । কারণ এই নিয়ে পর পর চার বছর ক্লাস সিক্সের খাতায় তার নাম রাখতে বাধ্য হওয়ায় স্কুল-কর্তৃপক্ষ নাকি আন্তরিকভাবে লজ্জিত ।

ক্যাবলার ওপর রেগে গেলাম খুবই । কিন্তু তার দিকে তাকাতেই আমার সব রাগ এসে পড়ল নিজের ওপর ।

ক্যাবলা দাঁত বার করে হাসছে । এমন একটা সাংঘাতিক গুণলিপি নিয়ে এসেও কোন চোদ্দ বছরের ছেলে যে এমন নির্লজ্জের মত হাসতে পারে, তা ধারণা করাও পাপ । অথচ, আমিই নাকি এই ছেলের বাবা !

কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম ক্যাবলার মা'র শুভাগমনে ।

এই বত্রিশ বছর বয়সেও হঠাৎ কোথা থেকে যে তিনি এক নতুন ষ্টাইলে পা ফেলার কায়দা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, জানি না। কিন্তু অধুনা এই চলনটা আঠারো থেকে আটান্ন বছরাদের মধ্যে বেশ ভালভাবেই চালু হয়ে গেছে, উপলব্ধি করতে পারছি। সে যাই হোক; তিনি তাঁর সেই নবাবিষ্কৃত চালে ঘরে ঢুকে, কিছু না বলেই আমার হাত থেকে খপ্ করে ক্যাবলার গুণলিপিটা তুলে নিলেন। পড়ে বললেন, "বাড়ির মাষ্টারটার দোষেই বাছা আমার এবারেও ফেল করল। আসুক আজ হতভাগাটা। দেখাব মজা। মাস গেলে তিরিশটা করে টাকা পকেটস্থ করছে আর পড়াবার নাম অষ্টরম্ভা।"

কোনরকমে বললাম, "কিন্তু তোমার ছেলের স্বাভাবিক জ্ঞানেরই অভাব আছে বোধহয়, মাষ্টারমশাই বোঝাবেন কি করে?"

লোকাল ট্রেনের ষ্টার্টিং-এর মত এক ঝলক তীব্র ঝাঁকানি দিয়ে উঠল তাঁর তনুলতা। বলে উঠলেন, "রাখো তোমার বাজে কথা! যে ছেলের জ্ঞানের অভাব, সে কি অঙ্কে পাঁচ পেলেও বিজ্ঞানে এগারো পেতে পারে? কেবু আমার নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে। বিজ্ঞানে ওর খুব মাথা।'

এবার অবশ্য আমার কিছুই বলবার ছিল না। কি বলব ভাবছিলাম। কিন্তু দেখি, তিনি শ্রীমান ক্যাবলাচরণের হাত ধরে বেরিয়ে গেছেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার পড়তে লাগলাম—

আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে—
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধপিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

সন্ধ্যেবেলায় ক্যাবলার মাষ্টারমশাই এলেন। ভয় হল, ক্যাবলার মা কিছু একটা অনর্থ না বাধিয়ে বসেন।

কিন্তু অনর্থ তেমন কিছুই ঘটল না। ক্যাবলার মা গম্ভীর স্বরে তাঁর সুমুখে ত্রিশটা টাকা রেখে দিয়ে বললেন, "এই নিন আপনার এ মাসের মাইনে। কেবু এ বছরেও সামান্য একটুর জন্যে ফেল করে গেল। আমি ওর জন্যে একজন ভালো টিউটর রাখব।"

পাশের ঘরে বসে থেকেই বুঝতে পারলাম, মাষ্টারমশাই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কেবুকে নিয়ে তার মা ততক্ষণে বোধহয় সেই ঘর থেকেও বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাই নিঃশব্দে তিনিও বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

এর আগে যেদিন ক্যাবলার অঙ্কের খাতায় 'বোল্ রাধা বোল্ সঙ্গম হোগা কি নেহি' গানটা পাওয়া গিয়েছিল, সেদিনই যে ভদ্রলোক কেন বিদায় নেননি, সেটাই আশ্চর্য।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়েই ক্যাবলার মায়ের প্রথম দফা 'আপিল' আরম্ভ হল—"ওকে ভালো স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি করে দাও। মিছিমিছি একটা বছর আবার ক্লাস সিক্সে রেখে নষ্ট করে লাভ কি?"

যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গেই বললাম, "তাতে ওর কেরিয়ারটা খারাপ বই ভালো হবে না। ক্লাস সিক্সে ও যখন কাঁচা আছে, তখন আরো একটা বছর না হয়—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি একরকম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "বাজে কথা রাখো! আমি ভালোভাবেই জানি, কেবু আমাদের ক্লাস সিক্সে কাঁচা নয় মোটেই। এই স্কুলের হতচ্ছাড়া মাষ্টারগুলো বাছাকে উঠতে দেবে না বলে পণ করে বসেছে। দেখতে পাচ্ছ না, স্কুলের পড়াশুনা গোল্লায় পাঠিয়ে ওঁরা পিকেটিং করে রাস্তার মধ্যিখানে শুয়ে কিভাবে আইন অমান্য করে গেলেন?

এরপর আর ছাত্রদের আইন মেনে চলার উপদেশ দিলে তারা মানবে? আসল কথা, তুমি কেবুকে একটা ভালো জায়গায় ভর্তি করে দেবে কি না বলো?"

এই মাঝরাতে আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই ভেবে বললাম, "বেশ তাই হবে।"

কিন্তু এই বলাই যে আমার কাল হবে তা জানলে বোধহয় বলতাম না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবেমাত্র চায়ের কাপে মুখটা লাগিয়েছি, এমন সময় এল ক্যাবলার মা'র সেই প্রথম আপিলের দ্বিতীয় দফার শুনানি,—"আজ ওকে নতুন স্কুলে ভর্তি করতে হবে।"

চোখ কপালে তুলে বলে উঠলাম, "আজই!"

বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর এল, "হ্যাঁ, আজই।"

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় ক্যাবলাচরণকে নিয়ে ইণ্ডিয়ান ইংলিশ স্কুলে যাব, সব ঠিকঠাক, কিন্তু ক্যাবলার পাত্তা নেই।

এমন সময় ক্যাবলার মা ঘরে ঢুকলেন। শুরু হল তাঁর দ্বিতীয় আপিলের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শুনানি,—"ওকে ভর্তি করে দিয়ে আসবার সময় 'হিঁয়া আকে প্যার করো' বইটার দুটো টিকিট কিনে আনবে মনে থাকে যেন।"

বললাম, "না না, ওসব বই আমি দেখব না। একখানাই আনব।"

উনি সেই অপূর্ব ভঙ্গিমাতেই হেসে উঠলেন, যে ভঙ্গিমা আজ আমার দীর্ঘ ষোলো বছরের বিবাহিত জীবনকে মজিয়ে রেখেছে। আজও মজে গেলাম।

উনি বললেন, "ও মা, তুমি আবার কি বায়স্কোপে যাবে! আমি কেবুকে কথা দিয়েছিলুম, ও যদি এবারে ভালোভাবে পাস করতে পারে তো বায়স্কোপ দেখাব, তাই।"

কিন্তু কেবু ওরফে শ্রীমান ক্যাবলাচরণ যে কোনভাবেই সে শর্ত রাখতে পারেনি, এখন সে কথা স্মরণ না করিয়ে দেওয়াই ভাল ভেবে কথাটা ঘুরিয়ে দিলাম, —"কিন্তু কেবু গেল কোথায় ?"

"চুল আঁচড়াচ্ছে।"

অবাক হয়ে বললাম, "ও এতক্ষণ ধরে কি চুল আঁচড়ায়! চুলের বাহার কেন অত ?"

শুনে ক্যাবলার মা বোধহয় একটু ক্ষুণ্নই হলেন। কিন্তু সেই ভাবটা চাপা দিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আহা, এই তো বয়েস। এখন যদি একটু আধটু সাজগোজ না করবে তো করবে কবে ?"

বলতে না বলতেই 'চুলের উপর ঢেউ খেলে যায়' নিয়ে ক্যাবলাচরণ হাজির। ড্রেন-পাইপ ফুল-প্যান্ট, সূচী-মুখ জুতো ও ডেকরন হাওয়াই-পরা আমার ক্যাবলাচরণের সেই রূপশ্রী যেন আমাকেই ধৃতরাষ্ট্র বানিয়ে দিতে চাইল। অফিসে ধর্মঘট না হলে পুত্রের এ ধর্মমূর্তি দর্শনে বঞ্চিত হতাম নিশ্চয়ই। ধন্য হে ধর্মঘট!

বেরোবার আগে ক্যাবলার মা তাঁর ছেলেকে আদরের চুমা দিতে ভোলেননি। ছেলে অবশ্য 'ধেৎ' বলে একটা শব্দ করে রুমাল দিয়ে গাল মুছতে মুছতে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

যথাসময়ে ইণ্ডিয়ান ইংলিশ স্কুলে হাজির হলাম। প্রধানশিক্ষক মশাই আমার বিশেষ পরিচিত। সুতরাং আমার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে ক্যাবলাকে পরীক্ষা না করেই ক্লাস সেভেন এ ভর্তি করে নিলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় তিনি বলে উঠলেন, "একটা কথা বলব মিঃ মুখার্জি, যদি কিছু না মনে করেন।"

হেসে বললাম, "না না, মনে করার কি আছে ? বলুন না।"

উনি বললেন, "বাড়িতে যাতে একটু-আধটু পড়ে সেদিকে নজর

রাখবেন। অন্ততঃ চার ঘণ্টা বাড়িতে বসে না পড়লে পাশ করা যে সম্ভব নয়, আপনি নিশ্চয় সে কথা স্বীকার করেন।"

যথেষ্ট ভারিক্কিভাবেই দুবার 'নিশ্চয়' 'নিশ্চয়' করে উঠলাম।

উনি বললেন, "আসল কথা হলো, চুলের পেছনেই যদি দু'ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায় তবে আর ও পড়বে কখন, বলুন?"

ধাঁ করে কে যেন আমার গালে চড় বসিয়ে দিল বলে মনে হল। মনে হল, আমারই চুলের মুঠি ধরে কে যেন প্রচণ্ডভাবে নাড়াও দিয়ে গেল একটা।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লাম।

রাস্তায় আসতে আসতে ক্যাবলাকে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, প্রায় বার সাতেক সে মাথায় হাত দিয়ে 'দু'ঘণ্টার কসরত করে আঁচড়ানো' চুলটা 'ঠিক আছে কিনা' দেখছে। বোধহয় বাবার প্রতি অনেক কৃপা তার, তাই পকেট থেকে চিরুনিটা আর বার করেনি রাস্তায়। একবার অবশ্য 'টোকিও' 'টোকিও' বলে কি যেন গাইতে উদ্যত হয়েছিল সে আপনমনে, কিন্তু পরক্ষণেই আমার দিকে চোখ পড়ায় আর গাওয়া হয়নি।

হ্যাঁ, আসবার সময় 'হিঁয়া আকে প্যার করো' ছবির দু'টো অ্যাডভান্স টিকিটও কিনে এনেছিলাম। কারণ অল্পের জন্য সংসারে অঘটন ঘটানোর পক্ষপাত আমি করি না।

উল্টো পুরাণ

সুতপা ভট্টাচার্যের সাথে হিমাংশু সাহার বিবাহটাই একটা উল্টো পুরাণ। কোন বুদ্ধি দিয়ে, বা কোন যুক্তি দিয়ে এ রহস্যের যবনিকা আমিও তুলতে পারতাম না, যদি না হিমাংশুই আমাকে বুঝিয়ে দিত সব ব্যাপারটা।

ওরা দুজনেই আমার কলেজের সহপাঠী। ওদের মধ্যে কলেজ থেকেই একটু-আধটু আলোছায়ার খেলা চলছিল, আমরা সবাই তা জানতাম। কিন্তু বিয়ে যে ওদের কোন মতেই হতে পারে না, তা-ও জানতাম। হিমাংশুর মুখেই শুনেছি, সুতপার বাবা নাকি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। সুতপাই নাকি ওকে জানিয়েছিল যে, কোন অব্রাহ্মণ পাত্রের সাথে তাঁর মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করতে গেলে নাকি প্রস্তাবকারীকে হাসপাতালে যেতে হবে। হিমাংশুর মা-ও ঠিক তাই। তিনিও যে কিছুতেই কোন ব্রাহ্মণ কন্যাকে তাঁর পুত্রবধূরূপে ঘরে তুলবেন, এমন কথা কল্পনাও করতে পারত না হিমাংশু। অথচ এ হেন ভট্‌চায্যি-কন্যার সাথে বৈশ্য-পুত্রের বিবাহ হয়ে গেল, এবং উভয় পক্ষেরই অভিভাবকদের একান্ত আগ্রহে ও স্বীকৃতিতে।—ঘটনাটা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অভাবিতও।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে,—ওরা সাবালক-সাবালিকা যদি স্বেচ্ছায় কোন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের শরণাপন্ন হ'ত, তবে কার আর বাধা দেবার অধিকার থাকত?

না, তা থাকত না বটে, কিন্তু খাবে কি? ওরা জানত যে, ধনীর দুলাল-দুলালী হয়ে জন্মে শুধুমাত্র 'এটারনাল লাভ'-এর জন্য ভাঙা

কুড়ে ঘরে একটা অতি নগণ্য মাস-মাহিনার জীবিকায় নির্ভর ক'রে থাকতে হ'লে, সে 'লাভ' আর লাভ থাকত না জীবনে; দেখতে দেখতে অনেকের মতোই লোকসানে পরিণত হয়ে যেত।

ব্ল্যাকের সাড়ে তিন টাকা কিলো চাল নিজের রোজগারে কিনে খেতে গিয়ে, কিংবা পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সা লিটার দরে অজ্ঞাত তেলের ভেজালমিশ্রিত সরষের-তেল নামধারী কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে আঠারো টাকা কিলো দরের মুখপোড়া ইলিশ ভাজাতে গিয়ে অনেকের প্রেমেরই পিণ্ডি চট্‌কে যেতে দেখেছে ওরা স্বচক্ষে। সুতরাং 'ন্যাড়া বেলতলায় বার বার যায় না,' প্রবচনটিই ওদের বাপ-মাকে লুকিয়ে 'রেজিষ্ট্রি-ম্যারেজ'-এর পথকে বেমালুম ভুলিয়ে রেখেছিল।

মাঝে মাঝে হিমাংশু যে বিদ্রোহী না হয়ে উঠত, তা-ও নয়। সে সম্বন্ধে পরে ওরাই বলেছিল আমাকে।—

আত্মীয় পরিজনদের চোখে ধূলো দিয়ে প্রায়-দিনের মতো সেদিনও ওরা হাজরা রোডের সুবিখ্যাত 'চুপিসার' রেষ্টুরেন্ট ফেরৎ হয়ে সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মধ্য দিয়েই এসে পড়েছিল কলিতীর্থ কালীঘাটের কাছাকাছি।

কালীঘাট দেখেই তো হিমাংশুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। সে জিদ্ ধরল,—আজই, যেমন করেই হোক, বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। বিনা খরচায় মালাবদলের এমন ক্ষেত্র আর কোথায়?

বুদ্ধিমতী সুতপার তো চক্ষুস্থির! হৃদয়ও স্থির হবো হবো! বলে কি হিমাংশু! পকেটে মাত্র বাইশটা টাকা সম্বল, তাও আবার তার ায়ের কাছ থেকে নেওয়া দু'দিনের হাত-খরচ এটা! এমতাবস্থায় বিয়ে ক'রে ওরা দাঁড়াবেই বা কোথায়, খাবেই বা কি? এদিকে 'মডার্ণ আর্ট'-এ চলতে গিয়ে গায়ে তো তেমন গয়নাও পরে আসে নি সে

নিজে। ওদিকে দু'জনের বাড়ীর দরজাই তো মুখের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে চিরতরে।

কিন্তু হিমাংশু নাছোড়বান্দা! হয় এসপার, নয় ওসপার! ও বলেছিল, 'আগে এস, মা কালীকে সাক্ষী রেখে এখানকারই ম্যারেজ অফিসের খাতায় দু'জনে নাম লিখিয়ে ফেলি, তারপরে না হয় কোন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে উঠব। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা চাকরি কি আর জুটবে না?

হঠাৎ যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়েছিল সুতপা।

না। হিমাংশুর শরীর হিম-করা প্রতিজ্ঞায় নয়। দেখল সুতপা, অদূরে একটা 'টিউবওয়েল'কে ঘিরে কমপক্ষে পঞ্চাশজন মেয়ে-পুরুষ বালতি হাতে নিয়ে সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। টালার 'পাইপ' ফেটে যাওয়া এবং তার জন্য জলকষ্টের কথা ওদের জানাই ছিল। ওদের চাকরগুলোই গতকাল হিম্‌সিম্ খেতে খেতে জল এনেছিল, ওরা দেখেছে।

ঐদিকেই হিমাংশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সুতপা। ছোট্ট তিনটি প্রশ্নও করেছিল সেই সঙ্গে—ঘর তো আলাদা বাঁধতে চলেছ, কিন্তু অফিস থেকে ফিরে ঐ ওদের মতো জল যোগাড় করতে পারবে? —লাইন দিতে পারবে?—মারপিট করতে পারবে?

দমে গিয়েছিল হিমাংশু। আর বাক্যব্যয় না করে দূর থেকেই মা দক্ষিণা কালীকে প্রণাম জানিয়ে সুতপার হাত ধরে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল।

'তার চেয়ে বরং এস, আমরা একটা অভিনব প্ল্যান-মাফিক কাজ করি,'—বলেছিল সুতপা। 'আর এই প্ল্যানই আমাদের মিলনকে সহজ ক'রে তুলবে। দেখো আমাদের অভিভাবকরাই ঠিক আগে এগিয়ে আসবেন আমাদের বিয়েতে।'

'বলো, বলো, কি সে প্ল্যান?'—আনন্দের আতিশয্যে আধিক্যেতা করতে গিয়ে তাকে প্রায় জাপটেই ধরেছিল হিমাংশু। আরও হয়ত কিছু করত, কিন্তু হতচ্ছাড়া ট্যাক্সি-ড্রাইভারটার অতর্কিত খক্‌খকানিতে সব মাটি হয়ে গেল।

যাই হোক, অবশেষে ওদের বিবাহ-বন্ধনরূপ অবিশ্বাস্য পরিণতিটিই সুতপার সেই অভাবিত প্ল্যানের অনিবার্য ফল।

এবার সেই ঘটনাই বলব।

বাইরে যাই করুক, নিজের নিজের বাড়ীতে ওরা যথাক্রমে ভীষ্ম এবং হঠু ঠাকরাণীর খ্যাতিকেও ম্লান ক'রে দিয়েছিল। তাছাড়া হিমাংশুরা থাকত ঠন্‌ঠনেতে, আর সুতপারা নারকেলডাঙ্গায়; এবং 'পিরিতের নৌকো পাহাড়ে চলে' জেনেই ওরা চরে বেড়াত বালীগঞ্জ কিংবা কালীঘাট অঞ্চলে। সুতরাং 'ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না' কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে উঠেছিল ওদের জীবনে ও যৌবনে। আর, এরই সুযোগ নিয়ে সুতপা তৈরী করতে পেরেছিল তার সেই যুযুৎসু প্যাঁচের মতোই নিখিল অভিভাবককুলকে প্যাঁচাবানানো অভিনব প্ল্যান।

অন্যদিন হিমাংশুর হিমে নিজেকে হিমময়ী করবার মতলব থাকলে ফিরতি পথে কোন বান্ধবীর বাড়ীতে যেতে হবে বলে কলেজে বেরুত সুতপা। কিন্তু সেদিন আর বাড়ীতে কিছু ব'লে গেল না। এবং নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও বাড়ী ফিরল না।

এ রকম কখনও হয় না। বাবা কারখানা থেকে ফিরে মায়ের শুকনো মুখ দেখে কলেজে টেলিফোন করলেন। তখন রাত্রের কলেজও প্রায় শেষ হবো হবো। তাঁরা শুধু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দিনটা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, এবং এটা রাত্রি।

বলাবাহুল্য, সম্ভাব্য সব স্থানেই টেলিফোন ও দৌড়াদৌড়ি সাঙ্গ হলে লালবাজার, মিশিং সেণ্টার, রেডিও ষ্টেশন ও হাসপাতালে খবর দেওয়া হলো।

সুতপার বাপ্-মা পরস্পর পরস্পরের দিকে নির্ব্বাকভাবে তাকিয়ে জেগে জেগেই রাত্রিটা কাটালেন।

ওদিকে হিমাংশু কিন্তু কলেজ থেকে যথাকালে বাড়ী ফিরেছিল, এবং ফিরেই মাকে জানিয়েছিল যে, তাদের 'আড্ডাবাজ মহাসঙ্ঘে'র পিক্‌নিক্ আছে কাল ভোর বেলাতেই। সুতরাং জলখাবারের জন্য চম্‌চম্ কিনে দমদমে তাদের বাগান বাড়ীতেই তাকে থাকতে হবে সেদিন।

মায়ের পদধূলি শিরোধার্য ক'রে সুবোধ হিমাংশুচরণ বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছিল সোজা কালীঘাটে। এবং, যেন 'মায়েরই টানে' সেখানে হাজির ছিল সুতপাও। অবশেষে ঘোমটার আড়ালে সিঁথিঢাকা গিন্নীকে নিয়ে বাঁকুড়া থেকে সদ্য-আসা কর্ত্তামশাই সেই রাত্রিটা কাটিয়েছিলেন সেখানকারই কোন এক প্রাইভেট যাত্রীশালার ঘরে।

পরের দিন ভোর বেলাতেই দমদম রোডের এক জনবিরল স্থান পর্যন্ত এসে কালীঘাটের ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে নতুন আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলো ওরা নারকেলডাঙ্গায়! সেই সময়কার দৃশ্যটাও আমার দেখা নয়,—ওদের মুখেই শোনা। তবু দৃশ্যটা সত্যিকারের কল্পনা করতেও কষ্ট হয় না।

গালে মাখামাখি চোখের কাজল, এলোমেলো চুল এবং ছেঁড়া নতুন ট্রিংকল শাড়ীপরা আমাদের সুতপাকে সেই অবস্থায় দেখলে যে কোন পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়ে যেতে বাধ্য!

হঠাৎ এইভাবে ওদের দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও সুতপার বাবা তো হতভম্ব! ওঁদের মাঝখান দিয়ে মাথা নীচু ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল সুতপা।

ধীরে ধীরে সুতপার বাবার দিকে এগিয়ে এল হিমাংশু। তারপর বলল, 'আপনিই কি ওঁনার বাবা?' খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলেন তিনি, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এসব কি ব্যাপার বলুন তো?

বলা বাহুল্য ব্যাপারটা বলেওছিল হিমাংশু। কেমন করে তাদের বাগানবাড়ী থেকে বেরুবার সময় নির্জন রাস্তার ধারে দু'টি মাতালপ্রায় গুণ্ডার কবল থেকে অজ্ঞাত-পরিচয়া ঐ মেয়েটির নারীত্বের একমাত্র সম্বলকে লুণ্ঠিত হতে দেখে সে আর স্থির থাকতে না পেরে তাকে উদ্ধার ক'রে এনেছে, তারই কাহিনী ফলাও ক'রে ব'লে গিয়েছিল হিমাংশু। অবশ্য 'ধর্ষণ' 'অপহরণ' 'বলাৎকার' ইত্যাদি লাগসই কথাগুলো ঠোঁটের আগায় এসেও থেমে গেল ইন্সপেক্টর বাবুর দিকে তাকিয়ে। তাছাড়া 'শিবকে মারতে গিয়ে সাপকে লাগা'র মতো অনেক ক্ষেত্রে যে নিজেকেই নিজের গালাগালি লেগে যায়, সে কথা হিমাংশু জানত।

বাড়ীর ভেতরেও কাঁদতে কাঁদতে ঐ একই মূল কাহিনীকে 'চ্যাপ্টারাইজড্' করেছিল সুতপা।

সমগ্র বাড়ীটায় একটা 'চুপ চুপ' ভাব পড়ে গিয়েছিল। ইন্সপেক্টর সাহেবও ভদ্রঘরের মেয়ের এই অনিচ্ছাকৃত কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা নিয়ে আর জল ঘোলা না ক'রে বাবাকে দিয়ে 'মেয়ে এসেছে' লিখিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছিলেন। আর, সেখানে রণজয়ী বীরের সম্মানে বিভূষিত হয়েছিল হিমাংশু সাহা।

এরপর যা ঘটার, তাই ঘটেছিল। মেয়ের 'লাইফে' একটা যখন 'স্পট' পড়েই গেল, তখন এ মেয়ের বিয়ে আর হবে কার সঙ্গে? ব্রাহ্মণ তো দূরের কথা, কোন অব্রাহ্মণ সৎ পাত্রই কি এ মুখো হবে আর? তাছাড়া, হিমাংশু জানিয়েছিল (অবশ্য কয়েকদিন আসা-যাওয়ার পরে) যে, যেহেতু সে-ই ওকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ছিনিয়ে এনেছে, সুতরাং পরিপূর্ণ উদ্ধারের দায়িত্ব শেষ না করতে পারলে, সে নাকি

নিজের বিবেকের কাছেই খুব ছোট হয়ে যাবে। বিশেষ ক'রে গুণ্ডাদের হাতে যদি সুতপা দেবীর মৃত্যুই হতো, তবে এত গোল ছিল না। কিন্তু গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েও যদি ওঁকে সত্যিকারের উদ্ধার করা না যায়, তবে তার দায়িত্ব কার?

হিমাংশু যে পক্ষান্তরে মেয়েকে উপলক্ষ্য ক'রে তার বাপ্‌কেই উদ্ধার করতে চেয়েছে, সে কথা বুঝতে পেরে তার সাধুবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল সুতপাদের বাড়ী।

নিজের বাড়ীটা 'ম্যানেজ' করতেও এতটুকু বেগ পেতে হয়নি হিমাংশুকে। কারণ, 'এ্যাকসিডেন্টালী' একটা ব্রাহ্মণকন্যার জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ায় তার দোষ কোথায়? এখন বাবা-মা যদি ঐ ব্রাহ্মণ-কন্যাটিকে পরিপূর্ণ রক্ষা ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করতে চান, তবে আর আপত্তি করবার কি কিছু থাকতে পারে তার? সে কি বাবা-মার অবাধ্য হয়েছে কখনও?

সুতপার বাবা-মা এসে ধ'রে পড়েছিলেন হিমাংশুর বাবা-মাকে। শেষে ওঁরা যখন ওঁদের পায়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, তখন মহাপাতকের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য 'হ্যাঁ' বলতেই হলো ওঁদের।

পরে অবশ্য ওদের এই প্ল্যান-মাফিক বিয়ের কাহিনীটা উভয় পক্ষেরই কর্তা-গিন্নীরা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না ব'লে 'কিল খেয়ে কিলই হজম' করেছিলেন তাঁরা।

চিত্রাভিনেত্রীর বাড়ীর দালাল

মানুষের আয়ুটাকে যদি একটা ছ' ইঞ্চি স্কেল বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে চিত্রাভিনেত্রী ভাস্বতী চ্যাটার্জী তখন বোধ হয় দুই দশমিক পাঁচ ইঞ্চির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, বলা চলে। হয়ত উপমাটা ঠিক হল না, কিন্তু কথাটা যথার্থই। অন্ততঃ ভাস্বতী চ্যাটার্জীকে দেখে তখন তাই-ই মনে হতো। আর ভাস্বতী চ্যাটার্জী নিজেই বলতেন যে, তাঁর বয়সটা বরং ঐরকম হেঁয়ালির মধ্যেই ঢাকা থাকা তাঁর পক্ষে একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। কারণ, চিত্রাভিনেত্রীদের সঠিক বয়সটা জানা থাকলে বিশেষ বিশেষ শহরের রাস্তাঘাট বেশ নিরাপদ হয়ে উঠত, এবং বলাই বাহুল্য, তখন যখন-তখন সিনেমার লাইনে কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ কখনই পুনর্ঘটিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হতে পারত না। তখন অবশ্য জানতুম না যে, বয়স-লুকানো মূলধনকে ভাঙিয়েই তাঁর সৌভাগ্যের সেই ফলাও কারবার অত ফুলে ফেঁপে উঠেছিল।

পরে অবশ্য বুঝেছি, কথাটা নির্ভেজাল খাঁটি। ভাস্বতী চ্যাটার্জীর দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুবর্গই দেখেছিলেন, এবং দেখে এসে তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁরই অভিনীত কোন ছবির শুভ-উদ্বোধনের দিন সিনেমা হাউসের ম্যানেজারের মাথাটা কেমন দ্বিধাহীন ভাবে উদ্বোধিত হয়ে গিয়েছিল টিকিট-না-পাওয়া ভাস্বতী-ফ্যানেদের অভিনব রসবোধের চাপে। বলে লাভ নেই, কথাটা নলেন গুড়ের সন্দেশের মতই ভাল লেগেছিল ভাস্বতী চ্যাটার্জীর।

ভাস্বতী চ্যাটার্জী তাই মাঝে মাঝে প্রযোজকদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলতেন না যে, তাঁর জন্য একটু বেশী টাকা খরচ হলেও লাস্যময়ী ভাস্বতী চ্যাটার্জীর হাত-কাটা ব্লাউজ-পরা অবস্থায় অভিনীত ছবির প্রযোজকের ব্যাঙ্কব্যালেন্স দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে প্রতিবার।

প্রযোজকরাও স্বীকার করতেন একথা। তাঁরাও সেই জন্য লেখকদের অর্ডার দিয়ে রাখতেন যে, তাঁদের কাহিনীর নায়িকার রূপ-যৌবন যেন তন্বী-তারকা ভাস্বতী চ্যাটার্জীর জন্য 'প্রিভিয়াসলী এন্‌গেজ্‌ড' থাকে, নচেৎ তা ফিল্মের জন্য মনোনীত হবে না।

এ হেন সৌভাগ্যময়ী ভাস্বতী চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমার মত এক হতভাগ্য বাড়ীর দালালের আলাপ হল কেমন করে, সে কথা নিজেই যতবার ভেবেছি, ততবারই পুলকিত হয়ে উঠেছি।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি—

তখন এই আজকের মতই কলকাতাগত বাসাহীন মানুষকে ভালবাসা বিতরণের ব্রত নিয়ে প্রাইভেট দালালি করে সংসার চালাতাম। আর এই দালালির সূত্র ধরেই একদিন এক পরম মুহূর্তে দেখা হল সুখেন্দু দত্তরায়ের সঙ্গে। সুখেন্দু দত্তরায়—মানে, চিত্রাভিনেত্রী ভাস্বতী চ্যাটার্জীর কার-ড্রাইভার।

সুখেন্দু দত্তরায় নিজেই এসেছিল দালাল-আড্ডায়—মানে, গৌরী সেনের কেবিনে।

ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছিলুম আমিই প্রথম। পাশের দালাল বন্ধুকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলেছিলুম—'ওঃ, আমার হাতে যা ফাইন একখানা বাড়ী আছে, কি বলব! জল, যেন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা নদী। আর আলো? সূয্যি থাকলে রাত্তিরেও রোদ্দুর আসতে পারে। টেনেণ্ট থাকলে বলিস, সঙ্গে সঙ্গে করিয়ে দোব।'

বলা বাহুল্য, সুখেন্দু দত্তরায় আমার সেই টোপ গিলেছিল, এবং আমাকেই অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে একটু বাইরে আসতে।

এসেছিলুম। এবং তারপরই টানা গিয়ে হাজির হয়েছিলুম ভাস্বতী চ্যাটার্জীর তখনকার বাসাতে।

হ্যাঁ, বাসাটা দরকার ছিল খোদ ভাস্বতী চ্যাটার্জীরই। কিন্তু এই বাসাই তাঁর শেষ বাসা নয়। অর্থাৎ, প্রতি দু'মাস অন্তর তাঁকে

একটা করে নতুন বাসা ঠিক করে দিতে হবে, এই সর্তে মাইনে করে রাখতে চাইলেন তিনি আমায়।

অবাক হয়ে গিয়েছিলুম! সত্যি, ঠিক এখন এই আপনার মতই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম সেদিন আমিও।

বাসা চাই, ভাল ভাল বাসা চাই। প্রতি দু'মাস অন্তর একটা করে নতুন নতুন বাসা চাই ভাস্বতী চ্যাটার্জীর।

কিন্তু কেন?

ভাবলুম, ভাস্বতী চ্যাটার্জী বোধ হয় ভাড়া দেন না, তাই পালিয়ে যান এক বাসা ছেড়ে অন্য বাসায়। এরকম হ্যাবিটের বিস্তর লোককে দেখেছিও আমি আমার মক্কেলবধ-পর্বের সুদীর্ঘ জীবনযাত্রায়। দেখেছি, বেশির ভাগ মক্কেলই যে মারটা খায় দালালের হাতে, সেই মারটা ফিরিয়ে দেয় হতভাগ্য বাড়ীওয়ালাকে।

কিন্তু না, ব্যাপারটা তা-ও নয়। কারণ, আমার মাইনে তিনি অগ্রিম অগ্রিম দেবেন বলে স্বীকার করলেন, এবং নতুন নতুন বাসার নতুন নতুন বাড়ীওয়ালাকেও এক মাসের জায়গায় দু'মাসেরই ভাড়া অগ্রিম দিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু, বিনিময় ঐ একই—সে বাসায় তিনি থাকবেন ঐ দু'মাস মাত্র, তার একদিনও বেশী নয়।

মনে হল, বোধ হয় পাগলের ছিট্ আছে ভাস্বতী চ্যাটার্জীর মগজে! কিন্তু, সেই মনে হওয়ার পরক্ষণেই মনে মনে জিব কাটলুম। ছিঃ! তা-ও কি হয়! হাজার হাজার মানুষকে পাগল করে ছাড়ছেন যে ভাস্বতী চ্যাটার্জী, তিনি নিজে কি কখনও পাগল হতে পারেন? পাগল কি কখনও কাউকে পাগল করতে পারে? কাক কি কখনও কাকের মাংস খায়?

তবে কি? কি হতে পারে?

ভেবে পেলুম না! আর তা পাবার দরকারই বা কি?—এই

ভেবে বাজে কথা বলে মক্কেল না চটিয়ে রাজী হয়ে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে মাইনেও একটা ঠিক হয়ে গেল।

দালাল হিসেবে দালাল জাতটার যতই বদনাম থাক, আমি কিন্তু বেইমানি করতে পারলুম না একটুও। করতে হলও না। আর, সেটা না পারার এবং না হওয়ার মূলটাও সমূলে বলছি।

প্রথম প্রথম চারটে চান্স বেশ ভালই কাটলো। আট মাসে চারটে বাসা পাল্‌টাই হলো। আমার ওপর খুব বিশ্বাস জন্মে গেল ভাস্বতী চ্যাটার্জীর। ফিফ্‌থ্‌ বাসাটায় উঠে ঝড়াক করে আমায় আমার আগামী এক বছরের মাইনে এক সঙ্গে 'অ্যাড্‌ভান্স' করেও দিলেন।

অবাক হইনি। মেজাজী লোকের মেজাজ দালালদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু কি জানি কেন, ভাবনা হলো, হয়ত এটা বকশিশ দিয়ে আমায় এবার তাড়াবেন ভাস্বতী চ্যাটার্জী।

কিন্তু না, তিনি নিজেই বললেন—'এটা রেখে দিন দালাল মশাই। এর পরের বাসাটা আজ থেকেই খুঁজতে আরম্ভ করে দিন।

ভরসা পেয়েছিলুম, না ভরসা হারিয়েছিলুম, সে কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু আমারও স্টক ওদিকে খালি হয়ে আসছিল। প্রতি দু'মাসে একটা করে বাসা যোগাড় করা যে কি ব্যাপার, তা দালাল না হলে বোঝা যায় না। ছ' বছর স্রেফ ভাঁওতা মেরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মক্কেলের পয়সায় সংসার চালিয়ে অবশেষে তার তেরজন মেম্বারওয়ালা গোটা ফ্যামিলিকে বত্রিশ বর্গহাত ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ঘর পাইয়ে দেওয়া একরকম, আর দু'মাস অন্তর অনিবার্য বাসা বদলের দালালি করা আর একরকম। কিন্তু সে কথা থাক।

সে রাত্রে নিজের বাসায় ফিরে এসে ভাবলুম,—দূর ছাই, এই মওকায় ডুব মারি। এক বছরের টাকা তো পেয়েই গেছি, এখন ডুব

মারলে ক্ষতিই বা কি? তাছাড়া, এরকম ডুব তো সব প্র্যাকটিশনার-রাই মেরে থাকে। এবং আমিও যে কখনও মারিনি, তা-ও নয়। ধরা পড়া? দালালের বাড়ীর ঠিকানা কি ভগবানেও জানে? আর গৌরী সেন কেবিনের দালালেরা কখনও অপর দালাল বন্ধুর সাথে ঠিকানা-বলাবলির শত্রুতা করে না। কারণ, আজও পৃথিবীতে এই একটি মাত্র জায়গায় ভেজালহীন বন্ধুপ্রীতি থাকতে পেরেছে বলেই চন্দ্রসূর্য উঠেছে এবং বিশ্বজগৎ চলছে বলে আমার বিশ্বাস!

কিন্তু তবু পারলুম না। বড় বড় দেশনেতার টাকা মারা, আর ভাস্বতী চ্যাটার্জীর টাকা মারা যে এক নয়, সে কথা রাত্রের স্বপ্নের মধ্য দিয়েই বোধ হয় দেখিয়ে দিলেন আমায় আমার পিতৃপুরুষেরা।

দেখলুম, ভাস্বতী চ্যাটার্জীকে জ্যান্ত দেখবার জন্য কোন্ এক ফাংশনে লক্ষ লক্ষ মানুষ আকুল হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে বোশেখের বুকফাটা রোদ্দুরকেও হার মানিয়ে। দেখলুম, অবশেষে পুলিসের প্রহরাধীনা হয়ে সিনেমা হাউসের ভেতরে ঢুকে গেলেন ভাস্বতী দেবী। আর, তারপরেই ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ, গিন্নী-কর্তা, প্রেমিক প্রেমিকা, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী সবাই মুঠো মুঠো রাস্তার ধূলো তুলে নিয়ে মাথায় দিতে ব্যস্ত।

তারপর, তারপর স্বপ্নের মধ্যে দেখলুম এবং শুনলুম, সিনেমা হাউসের বাইরে টাঙানো মাইকের চোঙাটায় ভাস্বতী চ্যাটার্জীর গলা। সব নিমেষে চুপ!

কোন ভূমিকা না করেই ভাস্বতী দেবী বলতে লাগলেন—'বন্ধুগণ, আমার কাছ থেকে টাকা মেরে পালিয়েছে এক বাড়ীর দালাল। তোমরা যদি সত্যিই আমাকে ভালবেসে থাক, তবে তার টুঁটি……'

ঘুম ভেঙে গেল। এবং বলা বাহুল্য যে, তার পরটুকু আর দেখবার দরকারও ছিল না আমার। ওটা জানা। তারপর অবশ্যই দেখতুম, আকাশের তারকার মত অগণিত তারকা-ফ্যানেরা

স্বয়ং তাড়কার মত তেড়ে এসে মাংসের দোকানের পাশে পড়ে থাকা মাংসের ছাঁটের মতই আমাকে খাচ্ছে।

পরদিন সকালেই ভাস্বতী চ্যাটার্জীর তখনকার বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিলুম।

কোন ভনিতা না করেই আগের দিনের পাওয়া টাকাটা তাঁর সামনের টেবিলে রেখে আসল কথাটা বলতে যাবার আগেই ভাস্বতী চ্যাটার্জী নিজেই বলে উঠলেন—'আর নতুন বাসার দরকার নেই দালালমশাই। আপনি ও টাকাটা নিজের কাছেই রাখুন। ওটা আপনার বকশিশ রইলো। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

ভেজা ভেজা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে ভাস্বতী চ্যাটার্জী তাঁর মুখ থেকে তু'পাটি বাঁধানো দাঁত আস্তে আস্তে খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর, যেখানে আমার রাখা টাকাগুলো তখনও মৃদু মৃদু তুলছিল ফ্যানের হাওয়ায়।

বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করে দেখলুম, ভাস্বতী চ্যাটার্জীর কাঁপা হাতে ধরা ছিল যেন কি একটা বিশ্ববিখ্যাত সিনেমা পত্রিকার কপি।

ব্যাপারটা তখনও বুঝিনি। বুঝেছিলুম তারও কয়েকদিন পরে।

ব্যাপারটা প্রথমে প্রকাশ করতে চায়নি সুখেন্দু দত্তরায়। তবে অনেক ধরাধরির পর সে যা বলেছিল, তা এই—

এতদিন লোকে জানত, ভাস্বতী চ্যাটার্জীর বয়স বুঝি কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে। কিন্তু কোন্ এক বদমাশ পত্রিকাওয়ালা নাকি তাঁর আসল বয়স-রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছে আইনকেই আশ্রয় করে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভাস্বতী চ্যাটার্জীর একমাত্র ছেলে নাকি দূরে কোথায় থাকে, এবং তার বয়স নাকি বর্তমানে পঁয়তাল্লিশ বছর। সুতরাং…

সুতরাং, ভাস্বতী চ্যাটার্জীর পর পর কতকগুলি ছবি ফেল করবে।

সুতরাং, ভাস্বতী চ্যাটার্জীর বয়স নিয়ে তর্ক হওয়ার সকল সম্ভাবনা উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটে অযথা মারামারি বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং যুবকবর্গের বুক পকেটে কিংবা বালিশের তলায় আর তাঁর হাত-কাটা ব্লাউজ-পরা অবস্থার ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং······

সুতরাং, বাড়ীর দালালেরও আর দরকার নেই। কারণ, এবার তাঁর বাড়ীর ঠিকানা জানাজানি হয়ে পড়লেও, সকালবেলা উঠে সদর দরজায় আর কোন রামভক্তের মতো ভক্তি গদগদ যুবককে শুয়ে থাকতে দেখবেন না ভাস্বতী চ্যাটার্জী।

সুতরাং······

সুতরাং, মাইনে করা দালালবৃত্তিকে সেখানেই স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় বিদায় দিয়ে আবার এসে বসলুম এই গৌরী সেনের কেবিনে। এখন, এখানকার বেঞ্চিকে ভাঙা বলে মনে হলেও উপায় নেই। আছে কি ?

৫০ মেগাটন বোমা

প্রতি রবিবারের মতো সেদিনও সকালে উঠে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে মনোনিবেশ করেছিলেন নস্কর মশাই।

অনেকগুলির মধ্যে একটি বিজ্ঞাপন তাঁর মনে ধরলো ঃ

পঞ্চান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি, ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, পঁয়তাল্লিশ বৎসর য়স্ক সুদর্শন তরুণ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। বরপণ ইত্যাদি কিছুই লাগিবে না। কেবলমাত্র সর্বদিকে উপযুক্তা পাত্রী হইলেই চলিবে। ঠকানা—ইত্যাদি।

দরকারটা মেয়ের জন্য না হলে এমন ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতাকে গো-মূর্খ আখ্যা দিতেন নস্কর মশাই। যেখানে এক কথায় 'হস্তীর জন্য হস্তিনী চাই' লিখলেই কাজ হতো, সেখানে এতগুলো কথায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থের অপচয় করার জন্য তাকে ধিক্কার দিতে পারতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করলেন না। নিজের মেয়েকে দেখে হস্তিনী বলে মনে হলেও যখন তখন তাকে তাই বলে ভাবাটা তাঁর পক্ষে অন্যায় বলেই বোধ হচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি করে একটা টুকরো কাগজে বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানাটা লিখে নিয়ে গিন্নী হেমঙ্করীর উদ্দেশ্যে একটা হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি।

প্রায় প্রতি রবিবারেই পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে এইভাবে চেঁচিয়ে থাকেন নস্কর মশাই। অন্য ব্যাপারে নস্করের হুঙ্কারে ভয়ঙ্করী মূর্তিতে প্রাদুর্ভূতা হয়ে তাঁকে তস্কর বানিয়ে ছাড়েন হেমঙ্করী। কিন্তু এ ব্যাপারে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আসছেন তিনি এই ক'বছর ধরে।

হেমঙ্করীকে বিজ্ঞাপনটা পড়িয়ে শোনাতেই আশার আনন্দে ঝিক-মিকিয়ে উঠলো তাঁর পানখেকো কালো দাঁতের পাটি। এই এতদিন পরে হয়তো শালুর জন্যে উপযুক্ত পাটির সন্ধান এসেছে!

'নাও নাও, বাজারের থলেটা দাও।' তাড়াতাড়ি এক তাড়া কথা দিয়ে তাড়া দিয়ে উঠলেন নস্কর মশাই। -'তোমাদের বাজারটা করে দিয়েই এই পাত্রের খোঁজে বেরুবো। রবিবার ছাড়া তো আর সময় হবে না। এ সপ্তায় আর ছুটি নেই!'

কথাটা মনে ধরলো হেমঙ্করীর।

কর্তা বাজারে বেরিয়ে যাবার পরেই পাশের বাড়ীর চার বছরের বিচ্চু এসে হাজির। প্রতি রবিবারেই তার মা তাকে পাঠিয়ে খবরের কাগজটা ধার নিয়ে যান কিছুক্ষণের জন্য। উদ্দেশ্য হেমঙ্করীর অবিদিত নয়। তাঁর বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো যেমন আইবুড়ো শালুক রয়েছে, বিচ্চুর দিদিও তার মায়ের কাছে ঠিক তাই।

অনেক সময় শালুককে দেখতে-আসা অনেক পাত্রপক্ষকে দু' একদিন পরে আবার বিচ্চুদের বাড়ীতেও আসতে দেখেছেন হেমঙ্করী। কেমন করে এবং কিভাবে যে বিচ্চুদের কাছে ঐ পাত্রপক্ষদের ঠিকানা চলে যায়, সে রহস্য আজও ভেদ করতে পারেন নি তিনি। তবে এসব ব্যাপারে তাঁর সতর্কতারও অন্ত ছিল না কোনদিন।

সুতরাং এবারেও একটু বিব্রত হলেন হেমঙ্করী। কর্তার আবিষ্কৃত ঐ বিজ্ঞাপনটা বিচ্চুর মায়ের চোখে পড়ে, এ তিনি মনে মনে বরদাস্ত করতে পারলেন না। যেমন করেই হোক, খবরের কাগজ থেকে ঐ বিজ্ঞাপনটা যাতে বরখাস্ত হয়, তাড়াতাড়ি তারই ব্যবস্থা করলেন তিনি।

বিচ্চু ছেলে ঐ বিচ্চু! তাই আড়ালে শালুককে ডেকে ঐ বিজ্ঞাপনটা কেটে নিয়ে তবে খবরের কাগজটা বিচ্চুর হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দিলেন হেমঙ্করী।

তাড়াতাড়িতে কাঁচি খুঁজে না পেয়ে খামচা মেরে কাগজের ঐ অংশটুকু আশপাশের আরো খানিকটা অংশের সঙ্গে ছিঁড়ে নিয়ে বিচ্চুর হাতে ঐ-বিজ্ঞাপনহীন কাগজটা দিয়ে দিল শালুক। তারপর টুকরোটা কোথায় যে রাখবে, ভেবে না পেয়ে, ব্লাউজের মধ্যেই গুঁজে রেখে দিল সেটাকে।

যথাসময়ে খেয়েদেয়ে তেত্রিশকোটি দেবতার নাম আওড়াতে আওড়াতে তুপুর বেলাতেই পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন নস্কর মশাই। সঙ্গে নিয়ে গেলেন পেন্সিলে লেখা সেই পাত্রের ঠিকানাটা।

হেমঙ্করী পান চিবুতে চিবুতে শালুকের পাশে এসে বসে তার কেশ পরিচর্যায় রত হলেন।

অবাক হলো শালুক। যে মা ভুলেও তার সঙ্গে হেসে কথা বলেন না, সহসা তাঁর মধ্যে এ হেন ভাবের অভাবনীয় অভ্যুদয়ে কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠলো সে।

'মনে হয়, এ সম্বন্ধটা তোর লেগে যাবে শালু। পাত্রেরা কোন পণ নেবে না বলেছে। হয়ত এইবারে ঠাকুর আমাদের ওপর মুখ তুলে তাকালেন।'

মনে মনে আশার আলো যে শালুও দেখতে পায়নি, তা নয়। নিজের যৌবনটা শুধু শুধু বিছানাকেই ভোগ করাতে দিতে আর কে চায়?

তার ষোলো বছরে পদার্পণের পর মেয়ের বিয়ের জন্য মা-বাবার উদ্যোগ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সিনেমার কল্যাণে বিয়ের সাধ জেগেছিল শালুর।

এক একটা সম্বন্ধ এসেছে, আর প্রতিবারেই মা বাবার জল্পনা-কল্পনা শুনে পুলকিত হয়ে উঠেছে সে। তার পর কোনোটা পাত্রপক্ষের অতিরিক্ত দাবির গুণে, আর কোনোটা বা তার ভাল

চেহারা না থাকার দোষে, ভেঙে গেছে। এতে তার মা বাবার চেয়ে কম নিরাশ হয়নি সে নিজেও।

সামান্য কেরাণী বাপের কালো এবং কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া মেয়ের বিয়ে হওয়া একটু শক্ত বৈকি!

মাঝে মাঝে সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিপ্লব করবার কথাও ভেবেছে শালু। মাকে লুকিয়ে রাস্তার ধারের জানালা দিয়ে মরিয়া হয়ে সামনের রকে বসে থাকা ছেলেগুলোর দিকে মৃদু মৃদু হাসির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছে সে।

প্রতিদৃষ্টি যে পায়নি, তা-ও নয়। কিন্তু না পেলেই বরং ছিল ভাল। তবু যা হোক বিপ্লবের কথা ভাবতে ভাবতে খোলা জানালার হাওয়ায় দাঁড়িয়ে দিনগুলো কাটানো যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত ঐ প্রতিদৃষ্টির জ্বালায় জানালা বন্ধ করে দিয়ে নিজেই সরে আসতে বাধ্য হয়েছে শালু।

আট ন' বছর আগে চিড়িয়াখানায় গিয়ে কি যেন একটা জীবের চাউনি এবং অঙ্গ-ভঙ্গি দেখেছিল বলে মনে ছিল তার। সহসা ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে সেই চাউনি এবং অঙ্গ-ভঙ্গির একটা নিখুঁত মিল খুঁজে পেয়েই বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করতে সে বাধ্য হয়েছে। বিয়ে হয়নি বলে রামায়ণের নায়কের মতো অত অসহায় অবস্থা তো তার নয় যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শেষ পর্যন্ত যার-তার হাতে পড়ে সিদ্ধ হতে হবে!

অবশ্য বিপ্লবের পথে সত্যিকারের সহায়তা দিতে সক্ষম, এমন ছেলে যে দু' একটা তার চোখে পড়েনি, তা নয়। কিন্তু তাদের চোখে নিজেকে পড়াবার আগেই অন্য কেউ তাদের নিজেকে পড়িয়ে ফেলেছে। এই তো, বড় রাস্তার ওপারের ঐ লাল বাড়ীর চোখে চশমা-ওয়ালা সেই লোকটা, যিনি প্রায়ই রাস্তায় বেরিয়ে সময়ে অসময়ে তাদের জানালার দিকে তাকিয়ে হাই তুলতেন, তাঁর বিয়ে হয়ে গেল

তার চোখের সামনেই। 'হাই' জানলায় দাঁড়িয়ে তাঁর সেই হাই তোলা দেখে প্রথম প্রথম যতই 'হাই' চিন্তায় আই-ঢাই করে উঠুক না কেন শালুকের প্রাণ, আজ যখন ভদ্রলোক তাঁর নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় হাওয়া খেতে বেরোন, তখন নিজের মুখে নিজেই চুন-কালি মাখাতে ইচ্ছে হয় শালুর। অবাক হয়ে ভাবে, তার চেয়েও কালো এবং ততোধিক মোটা ঐ বউটা কি ভদ্রলোকের জীবনের সকল ক্লান্তি এমনভাবেই দূর করে দিয়েছে যে, এখন আর একবারও তাঁর হাই ওঠে না? যাকগে।

আজকের মতো এর আগেও অনেক সম্বন্ধ এসেছে শালুর। কিন্তু এমন ধরনের আসেনি। শুধু তার মতো চেহারার মেয়েই: চায়নি এই বিজ্ঞাপনে, তার সঙ্গে পণ না নেবারও পণ করেছে পাত্রপক্ষ। সবদিক থেকে এ সম্বন্ধটাকে রাজযোটকই বলা যায়।

সুতরাং মায়ের খুশির কারণ বুঝতেও কষ্ট হয় না শালুকলতার। তবু রোজ রোজ 'পোড়ারমুখী', 'ধুমসী', 'জগদ্দল পাথর' ইত্যাদি শ্রুতির পক্ষে অসুখকর বিশেষণে বিশেষভাবে বিভূষিত হওয়ার পরিবর্তে আজকের এই হঠাৎ পাওনা আদরের আদিখ্যেতাটা ভালই লাগল তার। তা ছাড়া বুকের মধ্যে রাখা সেই বিজ্ঞাপনের টুকরোটা মাঝে মাঝে খচ্ খচ্ করে খোঁচা লাগায় বসে বসে বিজ্ঞাপনেই বর্ণিত সেই অদেখা মহাপুরুষটিকে আপন কল্পনার তুলিতে রাঙাতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। নেহাৎ মনে মনেই ব্যাপারটা হচ্ছিল বলেই শালুর হাতের তালু লাল হয়ে ওঠে নি। কারণ তার গাত্রবর্ণের দৌলতে মুখ চোখের রাঙা ভাব তো আর কারো বোঝার উপায় নেই! মরুকগে।

এই সুযোগে চুলটা বাঁধা হয়ে যাওয়াই মঙ্গলের কথা।

সন্ধ্যাবেলাতেই অগ্নিমূর্তি নিয়ে ফিরে এলেন নস্কর মশাই

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনল শালু, বাবা মাকে বলছেন: 'আরে দূর দূর। ব্যাটা হতচ্ছাড়া ফোরটোয়েন্টিবাজ বলে কি না, আপনার মেয়ে যেমনই হোক না কেন, মেয়ে মানুষ তো বটে! ব্যাস, মেয়ে হলেই হলো। তবে কিনা আমায় একটা মুদির দোকান করবার মতো হাজার পনেরো টাকা দিতে হবে।'

অবাক হয়ে বললেন হেমঙ্করী:

'ওমা, সে কি কথা? তবে যে লিখেছে বরপণ লাগবে না?'

কথাটা শুনেই এমন একটি মুখ ভেংচি কাটলেন নস্কর মশাই, যা না দেখেও শিউরে উঠলো শালু। বাবা যখন মাকে মুখ ভেংচেছে, তখন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা অতি সাংঘাতিক। তাঁর মাথা-টাথা ঠিক আছে কিনা তাই বা কে জানে!

পণ নেবে না এমন পণ করা পাত্রের জন্য পনেরো হাজার টাকা দিতে হবার কথাতে হিম মেরে গিয়েছিলেন হেমঙ্করীও। ভাবছিলেন, পানের সঙ্গে দোক্তাটা বোধ হয় একটু বেশীই খেয়ে ফেলেছেন তিনি।

বিস্ময়ে, লজ্জায় এবং হতাশায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না শালুর।

চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে লম্পোটা জ্বালিয়ে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে ভাল করে সিটকিনিটা আটকে দিল। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে তার সকল বিস্ময়ের সেই বস্তুটির উদ্দেশ্যে ডান হাতটা গুঁজে দিল সে ব্লাউজের ফাঁকে। বার করল খবরের কাগজের সেই ছেঁড়া অংশটা।

লম্পের আলোয় কাগজটা মেলে ধরে বিস্ময়কর এবং হতাশাব্যঞ্জক সেই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুটা দেখতে গিয়েই খিল খিল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো শালুর। অনেক কষ্টে হাসি চেপে আর একবার কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে খুশী হয়ে উঠল সে। পাত্রের ঐ বিজ্ঞাপনটার সঠিক পরিচয় রয়েছে ওপিঠে নয়, ঠিক তার উল্টো

পিঠেই। ঐ বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের একটা হেড লাইনের কিছু অংশও ছিঁড়ে নিয়েছিল সে। আগের দিনে বিশ্বের কোন প্রান্তে কোন এক বিশ্বপ্রেমিক রাষ্ট্র কর্তৃক বিশ্বলোকের মঙ্গল কামনায় উৎসর্গীকৃত একটি হুঙ্কারময় ব্যাপারের সংবাদ ওটা। আর পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের বদলে সেটা দেখেই মেজাজটা এত খুশী হয়ে উঠলো তার। দেখল সে, জ্বল জ্বল ক'রে সেখানে যেন তখনও জ্বলছে লেখাগুলো :

একটি
৫০ মেগাটন বোমার
বিস্ফোরণ

কাগজটাকে এবার নিশ্চিন্ত মনেই লম্পের আগুনে জ্বালিয়ে দিল শালু। জানত সে, বোমাই ফাটে, বোমা-লেখা কাগজ কখনও ফাটে না।

পথে-বিপথে

সিনেমা হাউসটার সামনে বহু লোকের ভিড় জমে গিয়েছিল। তার মধ্য থেকে টুকরো টুকরো কথাগুলো কানে এসে লাগছিল। কেউ বলছে, 'মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিন।' কেউ বলছে, 'বেটাকে পুলিসে দিয়ে দিন।' কেউ বলছে, 'যা হবার হয়েছে, ছেড়ে দিন।'

পকেটমারের সেবা হচ্ছে ব'লে মনে হলো। এ জাতীয় ঘটনা কলকাতার পথে নিত্যই ঘটে।

পথে চলতে চলতে ভিড়ের মধ্যে অন্তত একবারও মাথা গলানো রোগ যাঁদের আছে, আমি তাঁদের দলছাড়া নই। সুতরাং এই ভিড়ের মধ্যেও একবার মাথা না গলিয়ে পারলাম না।

কিন্তু ব্যাপারটা দেখে আমি তো একেবারে থ! ক্ষেপে ওঠা পাবলিকের চক্রব্যূহের মাঝখানে অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের বহুপরিচিত গোবিন্দবাবুকে দেখতে পেলাম! পাড়ায় ওঁর একটা মুদির দোকান আছে, তাই ওঁর সঙ্গে ধার-সূত্রে আমার আলাপও আছে মোটামুটি। লোকটার স্বভাব-চরিত্র অবশ্য ভাল বলেই জানা ছিল আমার।

ওঁর মত দন্তহীন শার্দূলকে এই ভিড়ের প্রধান কেন্দ্র দেখে নিজের কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। স্বভাবতই রহস্য সমাধানের প্রলোভনে প্রায় গোটা পঞ্চাশ আমারই মতো রগড়বাজকে 'দাদা' 'দাদা' বলতে বলতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে গোবিন্দবাবুর সামনে। একটু যেন 'হিরো' 'হিরো' ভাব নিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কি ব্যাপার?'

ভেবেছিলাম ক্ষেপা পাবলিকের মধ্যে আমায় দেখে উনি বোধ হয় একটু রিলিফ পাবেন। কিন্তু ব্যাপার একেবারে উল্টো হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ একনাগাড়ে উনি শুধু ক্ষমাই চেয়ে যাচ্ছিলেন, এইবার আমায় দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতেই লুটিয়ে পড়লেন একেবারে আমার পায়ে। বলতে লাগলেন, 'এ জীবন আমি আর রাখব না মুখুজ্জে বাবু। শেষ পর্যন্ত আপনিও আমায় ভুল বুঝলেন?'

কিন্তু আমি যে তখনও কিছুই বুঝিনি, সে কথাটা বোঝাবার মত ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। দু' তিনবার শুধু 'কি ব্যাপার' 'কি ব্যাপার' করলাম। কিন্তু প্রতিবারেই উনি সেই একভাবেই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠতে লাগলেন।

ভিড়ের মধ্য থেকেই এবার একজন মুরুব্বি গোছের ভদ্রলোক হঠাৎ আমায় উদ্দেশ ক'রে বলে উঠলেন, 'কে দাদু আপনি ভুঁইফোঁড় সর্দারি করতে এলেন? ও ব্যাটাকে আমরা একটু মেরামত ক'রে দিতে চাই। ব্যাটাচ্ছেলে কিনা বায়স্কোপ দেখতে দেখতে সুমুখের সীটের এই ভদ্দরমহিলাদের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে গেছে?'

কথাটা শুনে আমি যেন মাটিতে মিশে গেলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথিত ভদ্দরমহিলাদের দিকে চোখ পড়ল আমার। দেখলাম, ভিড়ের মধ্যেই দু'জন অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের হাতাবিহীন ব্লাউজ ও হাকোবা কাপড় পরার কায়দা দেখে বুঝতে কষ্ট হলো না যে, তাঁরা দু'জনেই বেশ আপ-টু-ডেট। তাঁরাই এবার আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে লাগলেন, 'আপনার সঙ্গে এর বেশ ভালই আলাপ পরিচয় আছে দেখছি। জানেন, ইনি আমাদের সম্মানহানি করতে গিয়েছিলেন? এ রকম ইডিয়টকে জুতিয়ে ঠাণ্ডা করলেও রাগ যায় না।'

ঠিক এই সঙ্গেই একজন নব্য বাঙালী ডন-জোয়ান তাঁর নিজেরই ডান হাতের দুটো আঙুল মুখে পুরে দিয়ে অদ্ভুত এক সিটি দিয়ে যেন গোটা জনতাকেই চাঙ্গা করে দিল। তারপরেই শোনা গেল তাঁর মধুক্ষরা বাণী, 'বন্ধুর ওপোর সোহাগ দেখাতে এসেছে মাইরি। ওরও বোধহয় এসব অভ্যাস আছে একটু আধটু। চাঁদু, এদিকে একটু তাকাও তো বাবা!'

মেয়ে দু'টির দিক থেকে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার দিকে। তার ছবি আঁকা ব্রুশ শার্টের নানা রকম হিজিবিজির মধ্যে হঠাৎ এক পৌরাণিক রামভক্তের চেহারা ভেসে উঠল আমার চোখে। এতক্ষণ জনতার বিভিন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণ সহ্য করছিলাম কোনো মতে, কিন্তু এবার আর সহ্য হলো না। কারণ কে যেন কোথায় বলেছিল, শুনছি,—লঙ্কা অবরোধের সময় রাবণ নাকি বলেছিলেন যে, বরং তিনি রামের বাণে সবংশে জাহান্নমে যাবেন, তবু হনুমানের দাঁত খিঁচুনি সহ্য ক'রে বেঁচে থাকবেন না আর।

কিন্তু তাই ব'লে কি এমন অবস্থায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেরই পিঠের চামড়াটার রং বদল করাব? তাছাড়া, রাবণের ছিল দশটা মাথা, কিন্তু আমার যে মোটেই একটা!

অগত্যা মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে বুঝতে দেরি হলো না আমার একটুও।

বাড়ী গিয়ে কেবলই এই কথা মনে হতে লাগল,—গোবিন্দবাবু বলেছেন যে, ইণ্টারভ্যালের সময় নিজের 'রো' থেকে বেরুতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতে হাতটা নাকি তাঁর এক ভদ্রমহিলার গায়ে একটু জোরেই লেগে যায়। ভদ্রমহিলারা বলেছেন যে, তাতে নাকি তাঁদের সম্মানহানি হয়েছে। সব বুঝলাম। কিন্তু এইটুকুই বুঝতে পারলাম না যে, গায়ে হাত লেগে সত্যিই যদি তাঁদের সম্মানহানি হয়ে থাকে, তবে লোক জমিয়ে কি তাঁরা তা আবার ফিরে পেতে পারবেন? না আর কিছু?

আমি চলে আসবার পর গোবিন্দবাবুর ভাগ্যে যে কি ঘটেছিল, তা জানবার ঔৎসুক্যকে বাধ্য হয়েই দমন করতে হয়েছিল। কারণ ভদ্রলোককে বৃথা লজ্জা দেবার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। তা ছাড়া নিজের একচল্লিশ টাকা দেনার লজ্জা থেকে যে দৈবপ্রেরিত রেহাই আমি পেয়েছিলাম, তাঁর দোকানের দিকে পা বাড়িয়ে সেটাকে আর খুঁচিয়ে জাঁকিয়ে তুলতে চাইনি।

কিন্তু 'সত্য সূর্য্য অপেক্ষাও ভাস্বর' কথাটা কে যে বলেছিলেন ঠিক মনে করতে পারছি না বটে, তবে কথাটা যে খাঁটি, তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ ঐ ঘটনার চারদিন বাদেই সকল সত্য জানাজানি হয়ে গিয়েছিল শুধু আমার কাছে।

সিনেমা পাড়ার বিখ্যাত রেস্তোঁরা নির্জন গ্রীল-এ সেদিন রোজের মত বৈকালিক চা খেতে গিয়েছিলাম। বাইরের চেয়ারগুলি লোক ভর্তি হয়ে থাকায় বুদ্ধি ক'রে একটা প্রাইভেট কেবিন-এর সামনের পর্দাটা তুলতে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। বোঝা উচিত ছিল যে, সেটা আগে থেকেই রিজার্ভড।

অবশ্য তোলার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দাটা নামিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারই মধ্যে দেখবার জিনিষটুকু দেখে নিতে ভুল হয়নি আমার একটুও।

চকিতের মধ্যেই দেখেছিলাম, সেদিনের সেই দুই ভদ্রমহিলার একজন একটি ভদ্রলোকের মুখের কাছে নিজের মুখটা নিয়ে গিয়ে কি যেন বলছেন ফিস্ ফিস্ করে। বলা বাহুল্য, আমার বহুপরিচিত সেই ভাগ্যবানটিকেও চিনতে ভুল হয়নি আমার একটুও।

চা খাওয়া সেদিন আর আমার হয়ে ওঠে নি। এক রকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম। আর পথ চলতে চলতে বুঝতে পারছিলাম যে, পথ আর বিপথ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন অভিধানের অর্থ পাল্টাতে শুরু করেছে এবার নিশ্চয়ই।

গড়্গড়ির সন্ন্যাস

অনেক ভেবেই গড়্গড়ি মশাই অবশেষে স্থির করেছেন,—আর না, এবার অনিবার্যভাবে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করতেই হবে তাঁকে। এ সংসারচক্ররূপ গরুর গাড়ির চাকায় আবর্তিত হয়ে বৃথা কালক্ষয় করবেন না তিনি আর।

না, গড়্গড়ি বিপত্নীক নন, অবিবাহিত তো ননই। গিন্নী হেমঙ্করী সশরীরে বিদ্যমানা। ছয় ছেলে তাঁর। মেয়ে নেই।

ছয় ছেলের দাপটে নয়, মেয়ে না থাকার বিষাদে নয়, শুধু মাত্র হেমঙ্করীর ভয়ঙ্করী রূপ আর সহ্য করতে না পারার জন্যই সংসার ধর্মে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে তাঁর। জীবনে এসেছে অবসাদ।

ছয় ছেলের মধ্যে বড়টির মাথায় জল পড়া মাত্রই আলাদা হয়ে গেছে এই এক বছর হলো। দ্বিতীয়টিকে বাড়ীতে পাওয়া ভার। চাকরীর চেষ্টায় সারাদিন যে তিনি কোথায় থাকেন, কেউ জানে না। অবশ্য তিনি যে ইতিমধ্যেই ডুবে ডুবে জল ঘোলা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, সে কথা যেমন করেই হোক, টের পেয়ে গেছেন গড়্গড়ি। কিন্তু একটি ছোট কথার মাধ্যমে যে কোন রকম বড় ব্যাপার ঘটে যাবার আশঙ্কায় চুপ করেই ছিলেন তিনি। তৃতীয় ও চতুর্থটি যথাক্রমে কলেজ ও স্কুলে রগড়া-রগড়ি খাচ্ছে। পঞ্চমটি দু' বছরের। সে এখনও মায়ের কোল ছেড়ে উঠতে পারে নি। ষষ্ঠটি গর্ভস্থ, ওলো বলে।

বহুদিনের মতোই মনোমালিন্যের এক দিনের ঘটনা।—

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে দূর থেকে নিজেদের গলির মুখের রকে অকাল পক্কদের জটলা থেকে সুস্বরে গীত একটি অভূতপূর্ব গানের কলি শুনে গলির মুখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গড়্গড়ি।

একটি ছেলে 'দিল' খুলে গান জুড়ে দিয়েছে—'ঘটির ওপর কড়াই, ও ভাই মাগ-ভাতারে লড়াই।'

বলা বাহুল্য, গলাটি তাঁরই চতুর্থ-তনয়ের একেবারে নির্ভেজাল নিজস্ব।

বাড়ী ফিরেই ফেটে পড়লেন গড়গড়ি। হেমঙ্করীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এসব কি? ছেলেটাকে ওইসব বখাটে ছোঁড়াগুলোর সাথে মিশতে দাও কেন? বাড়ীতে থাকো কি করতে?'

ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি হেমঙ্করী। তাই হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। সেই সময় স্বয়ং চতুর্থ পুত্রের আবির্ভাব, এবং ছাতা তুলে তার দিকে গড়গড়ি মশাই ছুটে যেতেই চিৎকার করে উঠলেন গড়গড়ি-গিন্নী,—'দাঁড়াও! কি হয়েছে বলো।'

বললেন। সব ব্যাপারটা এবং গানের কলিটাও গড় গড় করে আউড়ে গেলেন গড়গড়ি; শুনে ছেলেকে সামনে দাঁড় করিয়েই চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন হেমঙ্করী,—'মারো দেখি একবার! ভারী তো মুরোদ! বেশ করেছে, খুব করেছে। নিজে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারো, আর ওরা বলতে পারে না? বেশ করবে বলবে।

হাত থেকে ছাতাটা পড়ে গিয়েছিল গড়গড়ির। স্ত্রীর কথায় নয়, চতুর্থটিই তাঁর দিকে যেভাবে তাকাল সেটা দেখেই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সেদিন রাত্রেই গিন্নীর পাশে শুয়ে শুয়ে মনে মনে সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প এঁটে ফেলেছিলেন গড়গড়ি। সে আঁটা পাকা হলো আর একদিন।

সেদিন ছুটি ছিল। শীতের সকাল। লেপ ছেড়ে উঠি উঠি করেও উঠেছিলেন না গড়গড়ি। গিন্নীর শত সাবধান বাণী উপেক্ষা করে লেপের তলায় চুপটি করে ঘুপটি মেরে পড়েছিলেন।

হঠাৎ দেখতে দেখতে লেপটা গা থেকে সটান উঠে গেল, এবং সন্থ গড়িয়ে আনা বালির কুঁজোর এক গ্লাস বাসি জল গড়গড় করে গড়িয়ে পড়ল গড়গড়ির গায়ে মাথায়।

চোখ চেয়ে দেখলেন গড়গড়ি, এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও স্বামীর সঙ্গে বাইশে ইয়ার্কির মোহ পরিত্যাগ করতে পারেন নি তাঁর গিন্নী। জলটা তাঁর সারা শরীরে লাগেনি, সুতরাং আইনতঃ কিছু বলা এ ক্ষেত্রে আরো বিপজ্জনক। কারণ তাঁর অর্ধাঙ্গের ওপর যে গিন্নীর রীতিমত অধিকার আছে, সে কথা শীতের কাঁপুনি নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে হাড়ে হাড়েই মালুম পাচ্ছিলেন গড়গড়ি।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আগের দিন রাত্রের বিরাগ, পরের দিন সকালে বাজারের তাগাদার মাধ্যমে অতিরিক্ত অনুরাগের সঙ্গেই জল হয়ে ঝরে পড়েছিল তাঁর অঙ্গে।

এ ছাড়া পাশের বাড়ীর দিদির সাথে গিন্নীর বায়স্কোপে যাবার সময় বাড়ীতে তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ ক'রে সংসারের 'ষ্টিয়ারিং হুইল' ধরে বসে থাকা, মায়ের আস্কারায় বিস্ফারিত-বক্ষ ছেলের সাথে পাড়ার কোন ছেলের মারামারির 'ফিনিশিং টাচ্' বাবদ তার বাপ জ্যাঠার সাথে ঝগড়া করা, এবং মাঝে মাঝে মাঝরাত্তিরে গিন্নীর সাথে সংসার খরচের সমস্যা নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে পরাজিত হওয়া গোছের অসংখ্য মর্মপীড়াদায়ক ব্যাপার তো লেগেই আছে।

একবার ভেবেছিলেন গড়গড়ি, আবার একবার ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে হেমঙ্করীকে একেবারে 'টাইট' করে দেবেন। কিন্তু সে গুড়েও বালি! খবরের কাগজ মারফৎ একদিন জানতে পারলেন যে, এক অর্ধাঙ্গিনী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও আর এক অর্ধাঙ্গিনীকে আহ্বান জানালে সরকার পূর্ণাঙ্গকেই স্বয়ং নিজের আতিথ্য দান করবেন। ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছেন গড়গড়ি যে, সে আতিথ্য নাকি আরো মারাত্মক! তাছাড়া 'টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল

তলায় বাস' করে আর লাভই বা কি? পুনর্বিবাহের ফলে পুনঃ পুনঃ গেরিলাযুদ্ধের আশঙ্কা তো থাকতই!

মাঝে একবার লুঙ্গি আর ফেজ টুপি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন বলে ভয়ও দেখিয়েছিলেন তিনি হেমঙ্করীকে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। হেমঙ্করী নাকি সহাস্যে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাহলে তাঁরও জড়ির কাজকরা বোরকা পড়তে আর কোন বাধাই থাকবে না। ওটা নাকি তাঁর অনেকদিনের শখ।

অবশেষে অনেক ভেবে সংসার পরিত্যাগ ক'রে চলে যাওয়াই মনে মনে স্থির করলেন গড়গড়ি।

আর না। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল, তিনি চলে গেলে এদের খাওয়া পরা থাকার কি হবে? কিন্তু তাতেও দমে যাননি তিনি। হেমঙ্করীর বাপের বাড়ীতে তাঁর বেশ প্রতাপ আছে, এবং হেমঙ্করী একথা বলতেও ছাড়তেন না যে, সেই মহাসুখের স্থানে তাঁর গমনের পক্ষে একমাত্র অন্তরায় এই গড়গড়ি। অর্থাৎ গড়গড়িহীনা হয়েও বাপের বাড়ীর দৌলতে যে হেমঙ্করীর জীবনটা গড়গড়িয়ে চলে যেতে পারবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহকেই প্রশ্রয় দেবার অবকাশ পেতেন না গড়গড়ি। সে জন্য এবার নিশ্চিন্তই হলেন।

কাউকে কিছু বললেন না গড়িগড়ি। সেবার মাসকাবারে মাইনে পেয়েই প্রথমে চারজোড়া গেরুয়া রঙের লুঙ্গি আর চারজোড়া ঐ একই রঙের পাঞ্জাবি কিনে বাড়ী ফিরলেন তিনি। তারপর গিন্নীকে লুকিয়ে তক্তপোশের তলাতেই লুকিয়ে রাখলেন সেগুলি।

সবই ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল গড়গড়ির। সেদিন রাত্রে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করার পরই, হেমঙ্করী ঘুমিয়ে পড়তেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। একবার কি এক সুতীব্র বেদনায় বুকটা যেন ভেঙে গেল তাঁর। ভাবলেন, না জানি কপিলাবাস্তুর বুদ্ধ কিংবা নদীয়ার নিমাইয়েরও কত কষ্ট হয়েছিল এইভাবে দারা-পুত্র-পরিবারকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবার প্রাক্কালে।

মায়া! মায়া! মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর এতদিনের তক্ত-তাউস সেই তক্তপোশের তলা থেকে নব-বসনের প্যাকেটটি বার ক'রে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকলেন তিনি ভাঁড়ার ঘরে। উদ্দেশ্য, সেখানেই বেশ পরিবর্তন ক'রে সোজা এগিয়ে যাবেন তিনি সদরের দিকে। কোন আদরই তিনি মানবেন না আর!

কিন্তু বেশ পরিবর্তন ক'রে যেমনি তিনি বেরুতে যাবেন, হঠাৎ 'ঝপাং' ক'রে তাঁর সামনেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। বাইরে থেকে কে যে শিকল তুলে দিল ভাঁড়ার ঘরে, ভেতর থেকে তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হলো না গড়গড়ির।

ব্যাপারটা ভৌতিক নয় বলেই ভয় পেলেন গড়গড়ি। এ ক্ষেত্রে চেঁচাবার সাহস হলো না তাঁর। সেই অবস্থাতেই মাথায় হাত দিয়ে পুরনো একটা বেবী ফুডের কৌটোর ওপর বসে রইলেন তিনি সারা রাত।

ভোর বেলায় ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে দরজা খুলে ভাঁড়ার ঘরে এসে ঢুকলেন স্ফীতোদরা স্বয়ং হেমঙ্করী। পেছনে পেছনে আরও তিনটি মাতৃভক্ত। তাদের পাঁচজনেরই মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

সংসার ত্যাগের সে সঙ্কল্পও পরিত্যাগ করেছিলেন গড়গড়ি।

ছেলেদের সামনে তাঁর সেই চৈতন্যবেশ মনে ক'রে সেদিন কান্না পেয়েছিল তাঁর। উঃ, কি সাংঘাতিক এই মেয়ে মানুষ!

তবে গড়গড়ি মশাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ শেষপর্যন্ত এইভাবে কেঁচে গেলেও সন্ন্যাসের 'ফিনিশিং' ছোঁয়াটুকু থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। অর্থাৎ যা দেখে ভগবান বুদ্ধ একদিন গৃহী থেকে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তা-ই দেখেই আবার সন্ন্যাস বাসনা পরিত্যাগ ক'রে গৃহী হয়েছিলেন গড়গড়ি।

' সেটি হলো মড়া।

সেদিনই যথাকালে পান চিবুতে চিবুতে বিষণ্ণমনে ছাতা বগলে নিয়ে অফিসে যাবার পথে একটা শবযাত্রা দেখে সবিস্ময় পুলকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন গড়গড়ি।

খাটিয়ার আন্দোলনে মড়ার মাথাটার বাম-দক্ষিণ নড়া-চড়াই এক সুন্দর 'ফিলোজফি' শিখিয়ে দিতে চাইল গড়গড়িকে। বুঝলেন গড়গড়ি, মড়া যেন বলছে,—যতদিন বাঁচবে, ততদিন পালাবে কোথায় চাঁদ? অপেক্ষা করো, যেদিন আমার মতো 'ফাইনাল' ডাক আসবে, সেদিনই এইরকম মহানন্দে মাথা দোলাতে দোলাতে যেতে পারবে, তার আগে নয়।

এতবড় 'ফিলোজফি' কটা সন্ন্যাসীর বরাতে জোটে?

দেখলেন গড়গড়ি, যেন 'আর আসব না' 'আর আসব না' বলতে বলতেই মাথা দোলাতে দোলাতে ছাতখোলা বাড়ীরূপ মহাশান্তির দিকে এগিয়ে গেলেন সেই 'ফিলোজফি টেলার'।

এতদিনে বুঝতে পারলেন গড়গড়ি,—শ্মশানযাত্রার সময় মড়ার মাথা কেন নড়ে?

ঝাঁটা-হাতে ভয়ঙ্করী হেমঙ্করীর মুখটা মনে পড়তেই এবার কিন্তু বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠেছিল গড়গড়ির। মনটা যেন কেমন আবার মোচড় দিয়ে উঠছিল বার বার।

তারপর হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ছাতাটাকেই আরো জোরে আঁকড়ে ধরে জোর কদমে পা চালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

হাজরী খাতায় লাল দাগ পড়বার আগে যেমন করেই হোক অফিসে পৌঁছুতে হবে তাঁকে।

চিত্রাভিনেতার চিকিৎসক

রোগীর আরোগ্যের ওপর ডাক্তারের হাত থাকে না, এ কথা যদিও অনেক অনৈশ্বরবাদী ও স্বীকার করেন, তবু মাঝে মাঝে রোগীর না সারার ওপর যে ডাক্তারের সরা নির্ভর করে, এ কথা জানেন ? শুনুন তবে।

কাগজে বোধহয় অভিনেতা অনিন্দ্যসুন্দরের অসুস্থতার সংবাদ আপনিও পড়ে থাকবেন। আমিই ছিলাম ওঁর চিকিৎসক।

হয়েছিল ওঁর সর্দিজ্বর। ভাবনার তেমন কিছুই ছিল না ! কিন্তু অভিনেতা অনিন্দ্যসুন্দরের হঠাৎ খেয়াল হলো, তাঁর ফ্যানেরা বৃথাই তাঁর পেছনে প্যান্ প্যান্ করে, না তারা সত্যই তাঁর জন্মে হাটে 'হার্ট' বিকিয়ে বসে আছে,—তা দেখবেন।

বাঁশ থেকে কাগজ তৈরী হয়, তা তো আপনিও জানেন ! সুতরাং কাগজওয়ালারাও 'রেডি'। তাঁরা 'ফ্রন্ট পেজ'-এ বড় বড় হরফে অনিন্দ্যসুন্দরের অসুস্থতা এবং তাঁর চিকিৎসক হিসেবে আমারও নাম-ঠিকানা ছাপাবার বন্দোবস্ত করে ফেললেন। কি ভাগ্যিস আমার বাবার নামটাও তাঁরা সেই সঙ্গে ছাপাবার কথা ভাবেন নি, তা না হলে বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে বসেও তাঁকে অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করতে হতো, মালুম পাচ্ছি।

সংবাদ তো বেরুলো।

ব্যাস, আর যায় কোথায় ! দলে দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও কিশোর-কিশোরীর আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেল আমার ক্ষুদ্রায়তন ডিসপেন্সারীতে। তাঁদের সবারই এক প্রশ্ন : আমাদের অভিনেতা অনিন্দ্যসুন্দর কেমন আছেন ? তিনি কি বাঁচবেন না ?

বাধ্য হয়েই একটা কাগজে তাঁর সুস্থ থাকার সংবাদ লিখে টাঙিয়ে দিলুম। কিন্তু হাতের কাছে ডাক্তারকে পেয়েও শুধু 'নোটিশ' দেখে ফিরে যাবার পাত্র-পাত্রী কি আর আছে? দেখতে দেখতে সেই প্যান্‌পেনে অনিন্দ্য-ফ্যানেদের ঠ্যালায় আমার ঘ্যান্‌ঘেনে রুগীরাও ধীরে ধীরে গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করল।

সেইদিন রাত্রেই ডিসপেন্সারী বন্ধ করে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, ঠিক এমনই সময়ে দুটি ইয়ং-ম্যান আবির্ভূত হলেন আমার দুদিকে। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—'স্যার কি বাড়ী যাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে বললাম।

—'দেখুন, আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট টক্ আছে। আপনার কি সময় হবে?'

—'বলুন।'—যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখেই উত্তর দিলাম আমি। ওঁদের 'টক্'-টাকে এড়িয়ে যাওয়া খুব মিষ্টি ব্যাপার নয় বলেই মনে হলো।

সহসা ওঁদের মধ্যে একজন অপরজনের পকেট থেকে লম্বা মতো কি যেন একটা বার করলেন।

একটু লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলুম, ওটি একটি ভেজালহীন ভোজালি। বলা বাহুল্য, ওঁরা যে আমাকে 'ভোজ' দেবার জন্য 'আলী' সেজে আসেন নি, সে কথা বুঝতে না পারার মতো বেকুব আমি নই।

তবে কি প্রকাশ্য রাজপথে ডাক্তারের ওপর ডাকাতি! প্রমাদ গুণলাম। সহাস্যে বললেন ভোজালি কবলধারী ইয়ং-ম্যান ঃ

—'ভয় পাবেন না স্যার। তবে যদি আমাদের অনিন্দ্যসুন্দর না বাঁচে, তবে এই ভোজালি দিয়ে আমরা আপনার পেট ফেঁড়ে বদ্‌লা নিয়ে লেবো। খুব ভাল করে ওর ট্রিটমেণ্ট করবেন কিন্তু। মনে থাকবে তো?'

—নিশ্চয়ই থাকবে।'—তার কবলে ভোজালি দেখে কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হয় আমার নিজেরই কণ্ঠ। পেট ফেঁড়ে দিলে যে কণ্ঠও চিরকালের মত নীরব হয়ে যাবে, সে জ্ঞান তার টন্ টন্ করছিল। তা ছাড়া, আমার পেটের ওপর ওঁরা যে ট্রিটমেন্টের প্রস্তাব করলেন, তা শুনে আমার গোটা অঙ্গই কন্‌কন্ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

এবার অপরজন বললেন :

—'আর এই দেখুন।'

দেখলুম। তিনি ততক্ষণে একটা দড়িতে পাকানো গোলাকার পদার্থ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষায়। আর একটু যদি কম হতো তাঁর বয়েসটা, তবে নাড়ু হাতে নাড়ুগোপাল বলে তাঁকে ভাবতে ভালই লাগত আমার। কারণ ওঁদের দুজনেরই মাথার সামনের দিকটা নাড়ুগোপালের ঝুঁটির মতোই উঁচু হয়ে ছিল, সেটা আগেই দেখেছিলুম।

—'ওটা কি ?'—খানিকটা অনুমান নিয়েই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম!

—'বোমা স্যার আপনারা যাকে 'পটকা' বলেন। দেখে রাখুন। যদি আমাদের অনিন্দ্যসুন্দর মারা যায়, তবে এর একটা লাপাট্টাতেই আপনাকে ফ্ল্যাট-রাইস বানিয়ে দেবো। কেমন, মনে রাখবেন তো স্যার আমাদের রিকোয়েষ্টটা ?'

মনে পড়ে গেল, শরৎবাবুর 'রামের সুমতি'তে নীলমণি ডাক্তারকেও এর চেয়ে অনেক মোলায়েমভাবে রিকোয়েষ্ট করেছিল রামলাল। তবে সে শাসিয়েছিল তার মাতৃসমা বৌদির প্রতি আন্তরিক ভালবাসায়; কিন্তু আধুনিক রামরাজ্যের এই যুগল শ্রীরাম আমাকে যাঁর জন্যে রিকোয়েষ্ট করছেন, তিনি যে এঁদের কি 'সম', তা বুঝলুম না। তবু লাপাট্টাতে ফ্ল্যাট রাইস হয়ে যাবার ভয়েই গলাটাকে যথাসম্ভব নির্ভয় রেখেই বলে উঠি :

—'নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন। আপনারা কিছুই ভাববেন না। আমি আমার জীবনের বিনিময়ে তাঁকে ভাল করে তুলব।'

—'হুঁ।—অাঁ।'—রাষ্ট্রীয় ভাষার সুরতরঙ্গে উৎসারিত তাঁদের খুশী-খুশী ভাব আমার মনে কিছুটা বলসঞ্চার করল। তারপর তাঁরা সরে দাঁড়াতেই আমি গাড়ীতে উঠে যথাসম্ভব দ্রুত ষ্টার্ট দিলাম।

তাঁরা আমায় নমস্কার জানাতে ভোলেন কিন্তু নি।

বাড়ীতে এসেও ভিন্নস্বাদের সেই একই ব্যাপারের সম্মুখীন হলুম।

গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই এগিয়ে এলেন এক তরুণী। জানলা দিয়ে সটান্ তিনি তাঁর মুখপদ্মটিকে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস আমাকে করলেন:

—'অনিন্দ্যবাবু কেমন আছেন, ডাক্তারবাবু?'

খানিকটা ভয় যে পাইনি, তা নয়। কারণ এখন বাড়ীর বারান্দায় আমার স্ত্রীর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব নয়, এবং এ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লে যে আনিন্দ্যসুন্দরের কিছু একটা খারাপ-হওয়া পর্যন্ত আমাকে আর অপেক্ষা করতে হতো না, এ জ্ঞান আমার ছিল। তাই তাড়াতাড়ি উল্টো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

ঘুরে সেদিকেও এসে দাঁড়ালেন সেই অপরিচিতা তন্বী।

এরই মধ্যে দেখে নিয়েছিলুম, বারান্দায় যেখানে যাঁর দাঁড়িয়ে থাকার সম্ভাবনায় আমি বিচলিত, তিনি সেখানে নেই। বোধহয় সিনেমায় গিয়ে থাকবেন। স্বস্তিটা দীর্ঘতর হলো।

—'ডাক্তারবাবু' অনিন্দ্যসুন্দরকে ভাল করে দিন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি। আপনি যা চাইবেন, আমি আমার সাধ্যমত তাই দেবো।'

বলতে বলতে সত্যিই আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়বার উপক্রম করলেন তরুণী।

কোনোরকমে দু' এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠলুম :

—'ছি ছি, একি করছেন ? অনিন্দ্যসুন্দরবাবু তো ভালই হয়ে গেছেন। কাল বা পরশুর কাগজেই তাঁর সম্পূর্ণ আরোগ্যের সংবাদ পাবেন।'

দেখলুম, যেন এক স্বর্গীয় আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই তরুণীর মুখ। আমার শত বাধা সত্ত্বেও আবার আমাকে প্রণাম করে সে চলে গেল।

তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল, রাতারাতি গোটা দেশটাই পাগল হয়ে গেল, না আমিই পাগল হয়ে গেছি ?

এর পরের ঘটনা সত্যিই আমাকে পাগল করে দিত, যদি না চিকিৎসক হিসেবে বহু রুগীর সংস্পর্শে এসে মাথাটা আমার সাধারণ লোকের থেকে একটু পৃথকই হয়ে উঠত।

ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমার পক্ষে যথেষ্টই করুণ বলে মনে হয়েছিল।

সেদিন রাত সাড়ে দশটার সময় ফিরে এসে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ঘোষণা করেছিলেন আমারই সহধর্মিণী :

—'আরে দূর দূর। অনিন্দ্যসুন্দরের সামান্য সর্দিজ্বরের জন্যেই এত ? বেশ চাল চেলেছ তো একটা !'

কুইনাইন ইঞ্জেকসনে রুগী যেমন চমকে ওঠে ঠিক তেমনই চমকে উঠে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হয়েছিলুম :

—'তুমি কি করে জানলে ? তুমি কি তাহলে অনিন্দ্যসুন্দরবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলে ?

আমার প্রশ্নে এক অদ্ভুত ধরণের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এর সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠে :

—'নিশ্চই। তোমার মতো হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে এতবড় একজন

মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা যেখানে, সেখানে কর্তব্যের খাতিরেই যেতে হয়েছিল আমায়। অবশ্য ব্যাপারটা আগাগোড়া চালবাজী দেখে তবেই আশ্বস্ত হয়েছি।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। সহধর্মিণীর এই অনিন্দ্যপ্রীতির নিন্দা না করে বরং এটাকে স্বামীর সঙ্গে অনিন্দনীয় সামান্য ইয়ার্কি বলে মনে করে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলুম। সহধর্মিণীর সাথে এ জাতীয় সহাবস্থানের নীতি অবশ্য আমারই যে একচেটিয়া তা নয়। তাছাড়া বাইরের ঝামেলাতেই লঙ্কার ঝাল অনুভব করছিলুম মাথাতে, বাড়ীতেও তাই লঙ্কা-পোড়ার গন্ধ সইতে চাইছিল না মন।

এরও পরের কাহিনী অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত।

শুনেছিলাম, আমার বাবার বাবা নাকি তাঁর ছেলের বিয়েতে বরপণ নেননি। সেই পুণ্যেই কিনা জানিনা, সে যাত্রায় আরোগ্যলাভ করেছিলেন অভিনেতা অনিন্দ্যসুন্দর। এবং সেই সংবাদও ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজে। তবে সেবারে আর খবর হয়ে বিনাখরচায় বেরুতে পায়নি খবরটা। নিজের পয়সায় বিজ্ঞাপন দিয়েই খবরটা প্রচার করতে হয়েছিল আমাকে। এবং বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয়বার উপলব্ধি করেছিলুম, কাগজ কী থেকে তৈরি হয়।

অবশ্য খবর বেরুবার পর থেকে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে থাকতে হয়েছিল আমাকেই, কারণ অভিনেতা-প্রবরের আরোগ্যলাভের সংবাদে আত্মহারা এবং হারিণী হয়ে অনেকেই আমাকে যেভাবে অভিনন্দিত করতে এসেছিলেন বলে শুনেছি, তার ধাক্কা সামলাবার মত শক্তি আর একটুও ছিল না আমার।

সেই থেকে কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর চিকিৎসার ডাক আসবার সম্ভাবনা থাকলেই আগে থেকেই আমি অসুস্থ হয়ে থাকি।

বীরেন্দ্র চরিতম্

আলো ঝল্‌মল্‌ বিয়ে-বাড়ী। আনন্দের যেন মন্দাকিনী ধারা, কিন্তু সব আনন্দ যেন মিইয়ে গেল মুহূর্তে।

বর কাঁদ্‌ছে। হাউমাউ করে কাঁদ্‌ছে। চোখে হাত চাপা দিয়ে, ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌ছে। এরকম ব্যাপার সচরাচর চোখে পড়ে না। বিস্ময়ে সবাই তাই হতবাক!

এ কী কাণ্ড!

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি:

অনেক, অনেক ভেবে-চিন্তে তবে ঠিক করেছিল বীরেন, বিয়ে আর সে করবে না। মাকে বিয়ে করে বাবার কি হাল হয়েছে, তা তো সে সেই পাঁচ বছর বয়েস থেকেই দেখে আসছে। তার সামনেই মায়ের কাছে মার খেয়ে বাবা যখন ছেলেমানুষের মতো ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদতেন, বীরেনের মন তখন বীরোচিত প্রতিজ্ঞায় পাষাণ হয়ে উঠত। হ্যাঁ, সেই ন'-দশ বছর বয়সেই সে তার বেচারী বাবাকে করুণা করতে শিখেছিল। মনে মনে ভাবত: বাবাটা কি মুখ্যু, বিয়ে করতে গেল কেন মাকে?

পাড়ার আরো কয়েকজন কাপুরুষকেও ঠিক ঐভাবেই দেখেছিল বীরেন। সে দেখেছে, বড় বড় দারোগারাও তাঁদের স্ত্রীর কাছে কেমন কেঁচোটি হয়ে যান। হাকিমেরাও মুখ বুজে বউয়ের হুকুম তামিল করেন কেমন পোষা বেড়ালটির মতো।

সে যাই হোক্—বীরেন একরকম ঠিকই করে রেখেছিল যে, বিয়ে আর সে করবে না। কোন অবস্থাতেই নয়।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর বিধাতা লেখেন এক। শেষ পর্যন্ত তার বাবা-মায়ের জোর-জুলুমের কাছে হার তাকে মানতেই হলো। তাঁরা যথাকালেই তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে দিলেন।

অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে বীরেন বিয়ে করতে গেল। ঠিক গেল না, যেতে বাধ্য হলো।

কিন্তু তাই বলে সে ভেঙে পড়েনি। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল, বউকে সে একদম ভালবাসবে না। সে যা বলবে, ও তা শুনবে না। ব্যাস, তাহলে তার সেই শৈশবকালের প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হবে, বউও জব্দ হবে।

নির্ধারিত লগ্নেই বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হলো। বরকনেকে নিয়ে যাওয়া হলো বাসর ঘরে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরটাকে সরগরম করে তুললেন লাস্যময়ী যত চিরকুমারীর দল। নিজেদের ভাগ্যে জুটবে কিনা কে জানে, পরের বিয়েতে সেজেগুজে বাসর-রাত্রি জাগরণে এঁদের ভীষণ আগ্রহ। অনেক সময়ে এঁদের সাজের আধিক্যে বরের পক্ষে কনে ভুলও হয়ে যায়। নেহাৎ গাঁটছড়ার ব্যবস্থা না থাকলে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না।

কনে কিন্তু বাসর ঘরে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল না। গাঁটছড়া-বাঁধা চাদরটা কাঁধে নিয়ে, আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানালার ধারে। বোধহয় বিয়ের আগের রেষ্টুরেণ্ট-পার্কের ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। মুখটা থম্ থম্ করছে।

বীরেনও বসল না, বসতে পারল না। লাস্যময়ীরা হাসাহাসি করতে লাগলেন।

বীরেনের না বসার কারণ আছে। বাসরঘরে ঢুকেই কনে তাকে বলেছিল ঃ

"আপনি বসুন। আমি একটু খোলা হাওয়ায় দাঁড়াই। কেমন ?"

ব্যাস ! বসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়েছিল বীরেন্দ্রনাথ। প্রতিজ্ঞা সে ভঙ্গ করবে না কিছুতেই ! যে বউয়ের কথা সে একদম শুনবে না বলে পণ করে এসেছে এতদিন, শেষ পর্যন্ত বিয়ের রাতেই তার কথায় ওঠ্ বোস্ ! কভি নেহি।

কনে তাকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের ভুল হয়েছে মনে করে এগিয়ে এলো তার কাছে। তারপর সোহাগভরে তার একটা হাত ধরে টেনে ফরাসের ওপর তাকে বসাল। এবং নিজে পাশে বসল।

নিজের অজান্তেই বসে পড়েছিল বীরেন। নববধূর স্পর্শ তাকে তার প্রতিজ্ঞার কথা সাময়িকভাবে ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যখনই সে হৃদয়ঙ্গম করল যে হৃদয় হারিয়ে ইতিমধ্যেই সে বউয়ের কথায় ওঠ্ বোস আরম্ভ করে দিয়েছে, অমনি কেঁদে ফেলল। এ কান্না হেরে যাওয়ার কান্না;—ভীষণভাবে হেরে গেছে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নবকুলাধম বীরেন্দ্রনাথ।

লাস্যময়ী হাস্যমুখীরা তো হতভম্ব! বিয়ের রাতে ক্বচিৎ তাঁরা কনেকেই কাঁদতে দেখেছেন। কিন্তু বরও যে কাঁদে, তা তো তাঁরা শোনেনই নি কখনও।

ওমা, একী কাণ্ড! পাগল নাকি! কামড়ে দেবে না তো?

ছুট্ ছুট্। শনিবারের মহাতীর্থ রেসকোর্সের দেবীর মতো ছুটতে লাগলেন বাসর-দেবীর দল। বাড়ীশুদ্ধু হুলস্থুল।

ছ' বছর পরের ব্যাপার—

এই ছ' বছরে বীরেন্দ্রনাথের অন্নধ্বংসকারী কুলাঙ্গারের সংখ্যা শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে দশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং আগামী বছরে যে একসঙ্গে আরো দুটিও আসতে পারে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।

মনে হয়, বিয়ের ওপর বীরেনের সে পুঞ্জীভূত ক্রোধ ছিল, তা এবার গভর্ণমেন্টের ওপর বর্তেছে। অর্থাৎ যেমন করেই হোক সে সরকারের পরিবার-পরিকল্পনার সব জল্পনাটা ভেস্তে দিয়ে তবে ছাড়বে।

এখন অবশ্য প্রতি রবিবারে বউ বায়স্কোপে গেলে সন্তানদের জন্য দুধ গরম করার মহান্ কর্তব্য পুরুষবীর সেই বীরেন্দ্রনাথকেই করতে হয়।

একদিন বীরেনই আমাকে বলেছিল:

"বিয়ের সময় বরের হাতে হলদে সুতোয় দুব্বো দেয় কেন, জান?"

জানিনা, স্বীকার করেছিলুম।

বীরেন বলেছিলে, "বিয়ের পরে হাড়ে যা গজাবে, ওটা তারই অভ্রান্ত ইঙ্গিত।" বীরেনের অগাধ পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম আমি।

এই প্রসঙ্গে আর বেশী কিছু লিখব না। কারণ শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ আমার আপন ভাগিনেয়। এবং সবটুকু শোনার পর অনেকে হয়তো বিনাদ্বিধায় বলে বসবেন:

—নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

বিড়াল

—"কি গো ক্যাবলাকান্ত, বোলি আছো ক্যামোন ?"

ফিরে তাকালাম। দেখি, অতুল্যবাবুদের বাড়ী ডিঙ্গিয়ে আমার মাথার কাছের খোলা জানালাটা দিয়ে কখন ঢুকে পড়েছে জ্যোতিবাবুদের তাড়িয়ে দেওয়া সেই মেদি বেড়ালটা। রোজ রোজ এই হতভাগিনা আমার ন্যায্যপ্রাপ্ত সরকারী দুধের শ্রাদ্ধ করে যায়, তাই সদ্ভাবও খুব বেশী নেই তার সঙ্গে। কিন্তু করব কি ? আমার স্বর্গগত অগ্রজপ্রতীম শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত শর্মাকে একবার এই মার্জারী খুব কয়েকটি কড়া কড়া উপদেশ দিয়ে গিয়েছিল—সেই সূত্রে এ আমাদের গুরুতর কুল-গুরুণী ! সুতরাং আমি আর কোন লজ্জায় একে প্রহার করতে যষ্টি উত্তোলন করি। তাছাড়া আমার দাদাই যখন এর শ্যেনদৃষ্টি থেকে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধটুকুও বাচাতে পারেন নি, তখন নিভান্ত অবোধ এই ক্যাবলাকান্ত বা কোন্ যুক্তিতে সরকারী দুধটুকু এর মুখ থেকে সরাবে ? সরকার যে সবাকার, এ আর এখন বোঝে না কে ? অধিকন্তু আজকে গাঁজার মাত্রাটাও একটু বেশী হয়ে গেছে। কাজেই এই ভীষ্মের শরশয্যা থেকে ওঠবার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই যথাসম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করতে হলো। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "তা একরকম ভালই আছি।"

"ভালো আছো !"—বিস্ময়ের সাথে খানিকটা তাচ্ছিল্য মিশিয়ে প্রশ্ন করল মার্জার-কুমারী, "অবাক কোরলে তুমি ক্যাবলাকান্ত, আর হবে নাই বা কেন ? তোমাদের এই গুণের জন্যই তো তোমাদের ভেভ ভালো লাগে—দিব্যি পেটে বিষ লুকিয়ে মুখে অমৃত উদ্গার কোরতে পারো। ভালো ক্যামোন আছো, তা তো বুঝতেই পারছি, তবু বোলবে, ভালো আছি। বাঙালী হোয়ে জন্মেছো বোলে বি, এ, পাশ কোরে একটা টিউশানীও জোটাতে পারো নি, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে দশবার নাম 'রিনিউয়াল' করালে, পেটের দায়ে নিজের স্ত্রী বা ভগ্নীকে

চাকরি করতে দিয়েছো, নিজের ছেলের হাতে দু'বেলা ধোলাই খাচ্ছো, তবু বোলচো, ভালো আছি। সত্যি ক্যাবলাকান্ত, তোমাদের ভালো থাকাও য্যানো তোমাদের এক একটা আধুনিক বাংলা কবিতা। চমৎকার!"

রেগে উঠলাম। সামান্যা মার্জারী—হোক না সে আমার স্বর্গগত দাদার তত্ত্বকথার গুরুণী,—তবু সে কোরবে আমাদের কাজের সমালোচনা!

বেশ খানিকটা ঝাঁঝের সাথেই ব'লে উঠলাম, "ও হে মার্জারি, আমরা কি করছি না করছি তা তোমার মুখে শুনতে চাই না। আর, আধুনিক বাংলা কবিতার কথা ওভাবে বোলো না তুমি, তুমি এর বোঝো কি?"

এবার হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে উঠে ব'লে উঠল বিড়ালরাণী, "ঠিক বোলেছো। তোমাদের ঐ আধুনিক কবিতা বোঝবার ক্ষ্যামতা সত্যিই আমার নেই। আর কারই বা তা আছে? যে লেখে তারও কি তা বোঝবার ক্ষ্যামতা আছে?"

"বলো কি?"—এবার বেশ উৎসাহের সাথেই জিজ্ঞাসা করতে হলো, "তুমি কি কখনো আধুনিক বাংলা কবিতা পোড়েছো?"

"পোড়েছি মানে? রীতিমতো পোড়েছি। কবিতা পড়ার পর তোমাদের ডিসপেনসারী (ডিক্সনারী) খুঁজে দেখবার কতো চেষ্টা কোরেছি, কিন্তু বেড়ালদের জন্যে কি আর কোনো ডিস্‌পেনসারী লেখা হয়েছে গা? তা যাক্ গে, শুনবে একটা কবিতা?"

ওর আগ্রহ দেখে ওকে আর বিমুখ করতে ইচ্ছে হলো না। বললাম, "বেশ, শোনাও দেখি একটা।"

মার্জারী উৎফুল্ল হয়ে আরম্ভ করল—

"তোমার ঠোঁটটি য্যানো পাতলা বেলের খোসা,
চোখ দুটি য্যানো বঙ্গোপসাগরের কাজল আঁকা।

ওগো প্রিয়া, মম হিয়া
স্ফুটনিক সম তব তরে কেবলই আকাশ পানে ওড়ে।
সেদিন গভীর রাতে তোমারে হেরিতে
পথে যেই যাই,
দেখি একটি শৃগালিনী হাঁ করিয়া মোর পানে—"

"থাক্ থাক্ আর দরকার নেই।" —চিৎকার করে বলে উঠলাম। গাঁজার নেশার সাথে শৃগালিনী কবিতার নেশাটা মিশে য্যানো ইনকাম ট্যাক্সের শমনের মতো বুকে মোচড় দিয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, হার্টফেল কথাটার প্রকৃত মানে কি ভয়ানক! এবং লোকে যখন-তখন 'হার্টফেল'ই বা করে কেন?

"কি হোলো?" ক্ষুদে চোখে পিটপিট ক'রে তাকাতে তাকাতে বলে উঠলো বেড়ালরাণী। মুখে তার কৌতুকের হাসি।

কিন্তু হেরে গেলে তো চলে না। বললাম, "শৃগালিনী হাঁ কোরে কি কোরছিলো, সাদা গদ্যে বলো শুনি। আর কবিতা ভালো লাগছে না আমার।"

—"আরে, এও বুঝলে না? ঐ মেদি শৃগালটাই তো কবির মানসী প্রিয়া। হাঁ কোরে তেড়ে এসে কবিকে Kiss কোরে তাঁর সব কিছু নিংড়ে নিয়ে একেবারে কিস্‌মিস্ বানিয়ে দিয়ে গ্যালো।"

—"ধেৎ। হাঁ কোরে কি কেউ কাউকে Kiss করে? হাঁ করে কাউকে Kiss করতে গেলে তো কেস্ ডিস্‌মিস্ হয়ে যাবে!"

মৃদু হাসতে হাসতে বলল মার্জারী, "করে না? Kissing এর তুমি বোঝো কি? কোরেছো কখনও কাউকে Kiss? তোমার মতো 'কাউ' কি কাউকে Kiss করতে পারে?"

রেগেও গেলাম, আবার লজ্জাও পেলাম। সামান্যা এক মার্জারীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হলো না। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে মার্জারীকে যে তাড়িয়ে দেবো সে শক্তিও নেই। দাদার

মতো আমি তো আর আফিঙের নেশা করি না—এ একেবারে স্বয়ং নীলকণ্ঠের প্রসাদ! দুনিয়ার সবই ধোঁয়া!

তবু একটা কিছু এবার বলা দরকার। প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যই তাই বললাম, "আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষাই আসলে তুমি বোঝো না, তাই এর আজেবাজে অর্থ কোরেছো।"

আমার কথা শুনে মার্জারী হিস্ হিস্ কোরে হেসে উঠল। যেন এই রকম একটা কিছুর অপেক্ষাই সে করছিল। ব'লে উঠল, "আর ভাষার কথা বোলো না ক্যাবলাকান্ত। ঘেন্না ধরালে! ভাষা বোলে এখন আর কিছু আছে নাকি? আর বাংলা ভাষা? ওতো চাষার ভাষা। আসল ভাষা হোলো হিন্দী। ঐ কবিতাটা তোমাদের হিন্দীভাষায় কি রকম শোনায়, শুনবে একবার?"

বাংলা কবিতা শুনেই হৃৎপিণ্ডে মোচোড় লাগিয়ে দিয়েছে। না জানি, এবার হিন্দী কবিতা শুনিয়ে প্রাণেই না মেরে দেয়। তাই ভয়ে ভয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "না না থাক্—আর দরকার নেই। ভাষার ওপর তোমার যে খুব দখল তা আমি বুঝতেই পারছি হাড়ে হাড়ে।"

মার্জারী কি যেন ভেবে চুপ ক'রে গেল।

আমার যেমনই লাগুক না কেন, মার্জারী তবু তোকষ্ট ক'রে আমায় এতগুলো অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে দিলো! তাই তাকে কিছু পুরস্কারও দেওয়া দরকার। বিছানার অদূরে মেঝেতে থালা চাপা দেওয়া এক বাটী দুধের দিকে আঙুল দেখিয়ে ব'লে উঠলাম, "ঐখানে দুধ আছে, খেয়ে নিয়ে কেটে পড়ো।"

ঘেন্নায় নাক সিঁটকে মার্জারী ব'লে উঠল, "আরে রামো, তোমার ঐ দুধঢালা জলে আমার দরকার নেই। তোমার দাদা কমলাকান্তের আমলে আমাদের যে দুর্দশা ছিলো, তুমি কি মোনে করো এখনও সেই রকমই আছে? আরে দূর দূর। এখন আমরা রোজ মাংসের হাড় চিবুই, রোজ ক্ষীরের হাঁড়ি চাটি।

জিজ্ঞেস না করে পারলাম না—"কি কোরে কোথায় পাও ?"

—"জানো না বুঝি ? এখন যে রোজই ভোজ লেগে আছে !"

—"কিসের ভোজ ?"

—"জন্মতিথি গো, জন্মতিথি।"

—"সে তো এক বাড়ীতে একজনের বছরে একবার। রোজ তা হোলে এতগুলো কিসের ভোজ ?"

—"তাও জানো না ? একজনেরই জন্মতিথি এক বাড়ীতেই প্রতি মাসে মাসে হয় যে।"

অবাক হোয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সে কি !"

মার্জারী গোঁপে তা দিতে দিতে বোললো, "হ্যাঁ, জন্মতিথি অবশ্য একটা উপলক্ষ। আসলে এগুলো হলো গিয়ে তোমাদের ব্যবসাদারী চাল। মহাজনদের খুশী রাখা। তা কি আর আমরা জানি না মোনে করো ?"

আবার আমার চোখ কপালে উঠে যাবার জোগাড় হলো। বহু কষ্টে কপাল থেকে চোখ নামিয়ে কড়া সুরেই এবার ব'লে উঠলাম, "কিন্তু তুমি সামান্যা অসভ্যা মার্জারী হোয়ে অসামান্য সভ্য মানুষদের সম্বন্ধে এতসব বাজে কথা বোলে আমায় ডিস্টার্ব কোরছো ক্যানো ? যদি দুধ না খাও তো চোলে যাও—আমি এখন ঘুমুবো।"

—"বেশ তো, ঘুমোও। কিন্তু তুমি যে বোলছিলে হাঁ কোরে Kiss করা যায় না, দেখবে একবার ?"

—"কি কোরে ? তুমি Kiss কোরবে আমায় ?" চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলাম।

আবার হিস্ হিস্ ক'রে হেসে মার্জারী ব'লে উঠল, "ক্যানো, ক্ষতি কি ? আমি কি ভালবেসে Kiss করতে জানি না ? তোমরা তোমাদের মেয়ে মানুষের সাথে যে ভালবাসাবাসি করো তা-ই কি খাঁটি ? বরং বোলি শোনো, যদি ঠকতে না চাও তো ওসব মেকি

ভালবাসায় মোজে গিয়ে নিজের পরকাল ঝরঝরে কোরো না। জেনে রেখো, তোমাদের বেশীর ভাগ মেয়েরা সকালে অনিলদাকে ভালোবাসে, দুপুরে পরিমলদার পাশে বোসে গপ্পো করে, বিকেলে সুনীলদাকে নিয়ে লেক্ কিংবা গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়, সন্ধ্যেবেলা দিলীপদার সাথে রেষ্টুরেন্টে বসে ফাউল কাটলেট খেয়ে বাড়ী ফিরে ঠাকুর নমস্কার কোরে বাতাসা দিয়ে জল খায়, আর রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে পরাশর ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাকে। এদের এইসব ভালোবাসার পাত্র জামাকাপড়ের মতো পালটে পালটে যায়। ভালো মেয়ে অবশ্য দু' একটা আছে, কিন্তু তাদের নাগাল পাবে কোথায়? তারা আগুন, তোমার মতো খড়-কুঠো তার কাছে গেলেই জ্বলে পুড়ে শেষ হোয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমায় ভালোবাসো। আমি কথা দিচ্ছি, আমি তোমায় ছাড়া আর কাউকে ভালোও বাসবো না, আর Kiss-ও কোরবো না। তুমি আঙুরই থাকবে, কিস্‌মিস্‌ হোতে হবে না।"

আর সহ্য করতে পারলাম না। মার্জারী বড্ড বেশী বুকে হাত দিয়ে কথা কয়। এইভাবে যদি ও রাজনৈতিক সমালোচনা করত, তবে হয়তো যে কোনো শালুকবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তখন আমাদের উপায় হতো কি? অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেশরক্ষা আইনে ওকে আটকও করা যেতে পারত। কিন্তু দুটোর কোনটা করারই অধিকার যখন আমার নেই, অগত্যা তখন ওর ঠ্যাং ভাঙবার জন্যেই হাতাল-ভাঙা ছাতাটা খাটের পাশ থেকে তুলে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে তাড়া করতে গেলাম। কিন্তু হায় হায়! তখন কি জানতাম যে, আইনের আশ্রয়ে বিধানসভা ভাঙার মতো রাগের প্রশ্রয়ে বেড়ালের ঠাং ভাঙা অত সোজা নয়?

হতচ্ছাড়া নেশাটা দমাস্‌ ক'রে মেঝের ওপর একটা আছাড় মারলো আমায়। আর আমি মার্জারীকে দেখতে পেলাম না।

গঞ্জিকার নেশা, সুতরাং সবই ধোঁয়া!

কাবু

নারায়ণ কহিলেন, রাজা জনমেজয় সমীপে বৈশম্পায়ন-নামধারী জনৈক ভদ্র নাকি কলিযুগে বাবু নামক বিচিত্র মনুষ্যের কীর্তিকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু হে নারদ, আপনি কহিলেন যে, আগামী কলিযুগে ভারত-নামা বর্ষে স্বাধীনতা নামক এক বিচিত্র বস্তু লভ্য হইবার পর সেখানে নাকি কাবু নামেও অভিহিত হওয়ার যোগ্য এক প্রকার অতি ঘোরতর মনুষ্যদলের আবির্ভাব ঘটিবে। তাঁহারা কি প্রকারের মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এবং সেই বর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া কি কি কার্য সম্পাদন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহের সঞ্চার হইতেছে। আপনি অবগত আছেন, কলিযুগের আগমন-কারণে পূর্ব হইতেই আমি কানা সাজিবার ভান করিতেছি। সুতরাং কৃত্রিম হইলেও কানা নারায়ণের সমীপে কলি-যুগ-ধন্যকারী সেই কাবুরূপী মহাত্মাদের মাহাত্ম্য-কথা বর্ণন করিয়া বাধিত করুন।

কলহীকুলের চিরোপাস্য নারদ-ঋষি কোকেনসেবী শ্রীমান নারায়ণকে নমস্কার করিয়া বৈশম্পায়নের বাচনরীতি অনুকরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে কলিযুগের ভুঁড়িদাসপোষক! আমি সেই সাংঘাতিকবুদ্ধি, কখনও আহারনিদ্রাকুশল এবং কখনও আহারনিদ্রা-হীন কাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই বিভিন্ন ধরনের পোষাকপরিহিত, রহস্যাবৃতচরিত্র, কখনও নির্বাক এবং কখনও বহুভাষী, সদা অপরপক্ষের রন্ধ্রান্বেষী কাবুদিগের চরিতকথা কীর্তিত করিতেছি, আপনি অবধান করুন। হে নারায়ণ!

যাঁহারা গৃহমধ্যে ছাপ্পান্নটাকা মূল্যের লুঙ্গি পরিবেন, কিন্তু বাহিরে সাধারণের সম্মুখে যাইবার সময় আট-হাতি থানধুতি ছাড়া পরিবেন না, তাঁহারাই কাবু। হে আড়ম্বদার-প্রিয়! তখন এমন সব কাবু জন্মিবেন, যাঁহারা দুই বৎসরের শিশুর মতো সরল, অথচ নানা প্যাঁচে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘোল খাওয়াইতে পারদর্শী হইবেন। যাঁহারা বিশ্বলোকে বহুলপ্রচারিত কোন বিদেশী-ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আপনার সন্তান-সন্ততিদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া স্বদেশীয় অপর দুগ্ধপোষ্য বালক-বালিকাদিগকে দগ্ধকচু নামক এক বিপদসংকুল পদার্থ ভক্ষণ করাইবার মানসে বিশেষ কোন দেশীয় ভাষার চর্চার দ্বারা স্বদেশ প্রেমিক হইবার উপদেশ দিতে তৎপর থাকিবেন, তাঁহারাই কাবু। এই কাবুদল এমন মায়াশক্তিধর হইবেন যে, স্বদেশীয় সেই রাজভাষা সোজাপথে সেই বর্ষবাসী হতভাগ্যগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরসহ স্বয়ং আপনারও জ্ঞানাতীত পথে তাহা চালু করিয়া দিতে সচেষ্ট হইবেন। হে ভেজালদ্বার-গৃহ-নিবাসিনীপতি! তাঁহারা চলচ্চিত্র নামক এক অতি অদ্ভুত শক্তির মাধ্যমে স্বর্গোপ্সরা রম্ভাসদৃশা বহু মর্ত্যালোকবাসিনী নারীকে অশ্বিনীকুমারসদৃশ সুন্দর সুন্দর পুরুষবর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া উভয়ের মধ্যে সেই ভাষায় নানা শৃঙ্গাররসাত্মক কথা বলাইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা নানাপ্রকার দেহকেন্দ্রিক ভঙ্গিমা প্রদর্শন করাইয়া বালক-বালিকা অথবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে রম্ভা পরিবেশনে রত থাকিবেন। গলদেশে মৎস্যকণ্টক আটকাইয়া গেলে কদলী ভক্ষণে যেমন নিস্তার পাওয়া যায়, সেইরূপ ঐ চলচ্চিত্রের প্রভাবে 'বাপ্ বাপ্' বলিয়া সর্বত্র সেই বিশেষ স্বদেশীয় ভাষা ও কৃষ্টি চালু হইয়া যাইবে। নারায়ণ! সেই যুগে যাঁহাদিগের মাহাত্ম্যে ভারতনামা বর্ষের কৃষ্টিনামক পদার্থটি এইরূপে সদা আপনাপন 'গুষ্ঠীর পিণ্ডি' চটকাইতে আগ্রহী হইবে, তাঁহারাই কাবু।

হে তিলককাটা ভেকধারীবৎসল! যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় বলিয়া পদার্থটি অতিমাত্রায় প্রখর হইবে, যাঁহারা বিশেষ কারণে এবং বিশেষ ধরনে বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পদার্জনে পটু, অথচ যাঁহাদিগের মধ্যে শতকরা নব্বুইজনেরও সহজ পন্থায় এক ছটাক পরিমিত জমি ক্রয়েরও যোগ্যতা থাকিবে না, তাঁহারাই কাবু। তবে কলিযুগে এইসকল অসামান্য গুণশালী কাবুবর্গ কৃপণ হইবেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। ইঁহারা আপন আত্মীয়দিগকে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিবেন, মোসাহেবদিগকে মুক্তকলমে চাকরি দান করিবেন, এবং অন্যান্যদের মুক্তকণ্ঠে দান করিবেন ভাঁওতা। ইঁহারা বক্তৃতা দিবার সুযোগ পাইলে সকল নাগরিককে রাতারাতি রাজত্ব ও রাজকন্যা পাওয়াইয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেও কখনো পরাঙ্মুখ হইবেন না। বিনয় কাহাকে বলে তাহা ইঁহাদের নিকট হইতে আপনি তখন শিক্ষা করিয়া লইতে পারিবেন।

হে নারায়ণ! কাবুরা কাবু হইলেও নির্লজ্জের মতো কখনও নিজেদের কাবুত্ব প্রকাশ করিবেন না, বরং আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলকেই এই সুমহৎ কাবুত্ব দান করিবার জন্য তৎপর থাকিবেন। তাঁহারা সর্বধর্মসহিষ্ণু থাকিবেন, কিন্তু নিজেদের ধর্ম কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম বলিতে মাত্র একটিই থাকিবে,—ফাঁকা বচন। যদি বা কাবুদলান্তর্ভুক্ত কোন নিকৃষ্টবুদ্ধি কাবু কোনক্রমে এই ধর্মে আস্থাহীন হইয়া পড়েন, তবে সম্মিলিত কাবুবর্গ উদারচিত্ত কেলমাত্র ক্ষ—মা করিয়া তাঁহার টিকিটি কর্তন করিয়া লইয়া তাঁহার কুকীর্তি কীর্তন পূর্বক ছাড়িয়া দিবেন। টিকিহীন সেই সত্যাকার কাবুর পক্ষে তখন সত্যাগ্রহী হইয়া বাঁচিয়া থাকা বড়ই দুষ্কর হইয়া ওঠায় অচিরাৎ পরপারে যাইবার টিকিট কাটিতে হইবে। এইরূপে কোন কোন ক্ষেত্রে কাবুরাই কাবুদিগের ভক্ষ্য হইয়া উঠিবেন।

হে অনাসৃষ্টিলোকেশ্বর! আপনার অগ্রজ স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পদ্মাসন করিয়া বিরাজমান ছিলেন, তেমনই কাবুগণও গোটা দেশটিকে নিজেদের কীর্তিক্ষেত্র করিয়া তুলিবেন। মাসমাহিনারূপ কয়েক-সহস্র নির্দিষ্টসংখ্যক মুদ্রার নামমাত্র বিনিময়ে ইহাদের একটি দল জনগণ-অধিনায়ক সাজিয়া গোটা দেশটিকে কেবল সে—বা করিয়া যাইবেন। অপরদের মধ্যেও পরার্থে আত্মবিসর্জনের বহু উৎকৃষ্ট নজির পাইবেন। যখনই কোথাও কোন অমঙ্গল ঘটিবে, তখনই নামমাত্র পানাহারে জীবনধারণ করিয়া দিবারাত্র ইঁহারা কেবল ভাবিতে থাকিবেন; এবং মাঝে মাঝে আপনাপন গৃহের নিকটবর্তী কোন উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সভানামক এক আর্তরবমুখরিত এবং পরিণামে জনমানবশূন্য অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত করিবেন। আশার কথা এই যে, অমঙ্গলঘটিত স্থানে অন্য কোন প্রকারে পুনরায় মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হইলেই ইঁহারা সদলবলে সেই স্থান পরিদর্শনে গিয়া তথাকার ব্যক্তিবর্গকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দানে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। অনেক ক্ষেত্রে অনেকে অবশ্য সেই স্থানে একবারও না গিয়া ঘরে বসিয়াই দুর্গতদের দুর্গতি দূর করিবার মানসে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বুলি ছাড়িবেন। হে নারায়ণ! আপনি হয়ত জানেন না, তখন কোন কোন কাবু কর্তৃক বে-আক্কেল ক্ষুধার্ত জনতাকে দেয় গুলী অপেক্ষা এই বুলিগুলি বহুলাংশে সুন্দর ও পরিপাকযোগ্য হইবে।

হে নারায়ণ! দেবাদিদেব শঙ্করের নন্দী-ভৃঙ্গী ও অন্যান্যদের মতো এই সকল পূণচরিত পুণ্যবানদিগেরও বহুসংখ্যক চ্যালা থাকিবে। তাহারা সদাই বিভিন্নরকম ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। এই শ্রদ্ধা নিবেদনের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জীবৎকালে যে ব্যক্তি যাহা ভালবাসিতেন না, ইহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকালে তাহাই করিবে। এই সকল চ্যালাগণের 'হিঞ্চিক্ হিঞ্চিক্ ইয়া ইয়া' পর্যায়ের

সুললিত চিৎকার সহযোগে অক্লান্তিকর হস্তপদাদিসঞ্চালনে সকল কাবুই তালে তালে হাত-তালি দিতে বাধ্য থাকিবেন। কারণ আপন আপন কাবুদল-রক্ষার জন্য ইহারা না হইলে তাঁহাদের চলিবে না। তবে মাঝে মাঝে চ্যালারা যখন প্রকৃতিলুব্ধ হইয়া উঠিবে, তখনই একটু প্রমাদ গণিবার সম্ভাবনা। হে প্রভু! সেই সময় আপনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার মহাপ্রকৃতি লক্ষ্মীমাতাকে একটু সাবধানে রাখেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

হে অনন্তশয্যাশায়ী মহাবিলাসি! যাঁহাদিগের সাহিত্য, সঙ্গীত ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিবে না, অথচ যাঁহাদের অনুমোদনে এইসকল ব্যাপারের ধার ধারেন না এমন সতরঞ্চ খেলোয়াড়ও উপরি-উক্ত যে কোন বিষয়ে পুরস্কৃত হইবেন, তাঁহারাই অশেষ শক্তিমত্তাধিকারী সেই কলিযুগাবতার কাবু। যাঁহারা কোন নীতির দ্বারা আবদ্ধ নহেন, অথচ সদাই কোন না কোন একটি বিশেষ নীতির জন্য বড়াই করেন, যাঁহারা দেশ অপেক্ষা আপনাপন দলীয় স্বার্থের কথা বেশী বিবেচনা করিয়া নীতি গঠন করেন, তাঁহারাই কাবু। যিনি অপরের মধ্যে সঠিক কোন মতবাদ থাকিলেও তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইবেন না, বরং নিজেকেই অভ্রান্ত জানিয়া অপরকে উপহাসে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই কাবু। যিনি নিজেই পানাসক্ত থাকিয়া সেই পানীয় পদার্থের উপর হইতে অপরের শ্যেনদৃষ্টির বিলোপ সাধনের জন্য 'বর্জন' 'বর্জন' করিয়া গর্জন করিতে থাকিবেন, তিনিই কাবু। যিনি অপর কাবুদলের সহিত সরাসরি বুদ্ধিযুদ্ধে পরাভূত হইয়া ভিতরে ভিতরে শত্রুভাবাপন্ন কোন বিদেশীয়ের হস্তে দেশকে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিবেন, তিনিই কাবু। ইঁহারা কেহ কেহ অঙ্কনশাস্ত্রে অতীব পটু হইবেন। কারণ সেই বিদেশীয় দেশকে দিয়া আপন দেশের মধ্যে কোথায় কোথায় বজ্রবর্ষণ করাইতে হইবে তাহার নিখুঁত মানচিত্র অঙ্কনের মহান দায়িত্ব নাকি ইঁহাদের উপরেই

থাকিতে পারে। ইঁহাদের নিকট গদির জন্য মোহ বা লোভ এমনই প্রবল হইবে যে ইঁহারা জানিয়া-শুনিয়াও ইতিহাসের অভ্রান্ত পরিণতিকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। কোন কোন কাব এই সকল কাবুগণের বিদেশী-প্রীতিকে অতিরঞ্জিত করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের নিন্দা করিবেন বটে, কিন্তু নিজেরাও আপন অজ্ঞাতে অপরাপর বিদেশীয়ের নিকট মাথা পর্যন্ত বিকাইয়া বসিয়া থাকিবেন। হে নিশ্চল নারায়ণ! কলিযুগবিহারী এই কাবুগণের অধিকাংশ দল নিজেদের নিঃস্ব রিক্ত মানুষের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিবেন, অথচ দেশের এক স্থানে মানুষ না খাইতে পাইয়া মরিতে থাকিলেও প্রায় সকল কাবুর ন্যায় নিজেরাও উৎকৃষ্ট বাসমতী চাউলের পলান্ন ভক্ষণ করিতে থাকিবেন। কেহ ইহা দেখিয়া ফেলিলে তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, সাধারণ চাউল সাধারণ ভ্রাতা-ভগিনীর খাদ্য বলিয়াই তাহা বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা দুষ্প্রাপ্য চাউল ব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছায় এইরূপ শরীর পীড়নে ব্রতী হইয়াছেন। হে ললনাপ্রিয়! আপনার মাত্র দশটি অবতার, কিন্তু এক একটি দল হিসাবে ধরিলেও ইহাদের সংখ্যা গণনা স্বয়ং সরস্বতীরও কর্ম নহে। সুযোগ পাইলেই কাবুগণ ভিন্ন ভিন্ন কাবুদল গঠন করিতে থাকিবেন। অনেক সময় এক কাবুদলাবতারের সহিত অপর কাবুদলাবতারের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেখিয়া সাধারণে বিমোহিতচিত্ত হইয়া ইহাকে সত্য বলিয়া ভাবিবেন, কারণ সেই যুগে আপনার প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আমার প্রভাব এরূপ বাড়িবে যে, সেই যুগে 'কলহই সত্য, অবশিষ্ট মিথ্যা' প্রবচনটি সর্বত্র সমাদৃত হইবে। কিন্তু সাধারণে যাহাই ভাবুক, প্রকৃতপক্ষে এক অসাধারণ কাবুদলের সহিত অপর সুমহান্ কাবুদলের ঐরূপ সংগ্রাম সর্বক্ষেত্রেই নির্ভেজাল থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ যোগসাজস থাকিবে। সুতরাং অবতাররূপে আপনি চিরবিজয়ী হইলেও, যে কোন সময়ে যে

কোন কাবুদলাবতারের পতন ঘটিবে এবং তাঁহাদের এই নাম সর্বার্থসার্থক হইবে। তবে কাবুদলাবতারে ইঁহারা কে কখন কাহাকে যে বধ করিবেন, তাহা স্বয়ং সতীপতির পিতাও জানিতে পারিবেন না।

নারায়ণ! পুনরায় নিবেদন করি, অবধান করুন। বৈশম্পায়ন-কথিত কলিযুগের সেই বাবুগণের মতোই ইহাদের বাক্যও মনোমধ্যে এক, অপরের দ্বারা লিখিত এবং স্বনামে প্রচারিত লিখনে দশ, সম্মুখকলহে উচ্চ রক্তচাপজনিত কষ্টের জন্য শূন্য, এবং সাধারণ কথনে সংখ্যাতীত হইবে। হে লক্ষ্মীপ্রিয় অলক্ষ্য! যাঁহার যত্ন কেবল স্বদল সম্পর্কে বিপক্ষের সমালোচনায়, নিঃসন্দেহে তিনিই কাবু। নির্দলীয় কোনও কোনও কাবু অপরিপক্ক কদলাতে বিশেষ রুচিবান হইবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে সকলকে উহা প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দান করিবেন। ফলে তিনি নিজেই চিরকাল ঐ পদার্থ ভক্ষণের ব্যাবস্থা পাকা করিয়া লইবেন।

হে নারায়ণ! আমি যাঁহাদিগের কথা বর্ণন করিতেছি, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য নহেন। তাঁহারা যে অতি-মনুষ্য এ সম্পর্কে কি আপনার সংশয় জাগ্রত হইতেছে?

নীলপদ্মসদৃশ চক্ষু দুইটি ঈষৎ উন্মীলন করিয়া নারায়ণ একটি হাই তুলিলেন। তাহার পর কহিলেন, কিন্তু বৈশম্পায়নের সেই বাবুদলের সহিত আপনার কাবুদলের যখন এতই সাদৃশ্য, তখন ইঁহাদের জন্য এইরূপ স্বতন্ত্র নামকরণ করিলেন কেন?

নারদ কাবুসুলভ রহস্যময় মৃদু মৃদু হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন, হে অব্ধেশ্বর, বৈশম্পায়নের সেই বাবুদলের ন্যায় আমার কাবুবর্গেরও এক একটি ভদ্র ও পোষ্য নাম থাকিবে; কিন্তু ইঁহারা আমার প্রভাবে বিচালিত হইয়া বারংবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হইতে থাকিবেন। কখনও কখনও ইঁহারা আপনাপন মোসাহেবগণ কর্তৃকও এইরূপ হইবেন। আবার কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর বালক-বালিকাগণের

খুচরা মুদ্রা সঞ্চয়াধারসদৃশ এক চতুষ্কোণবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় কাগজাধারে কাগজ-পাতনরূপ অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডের পরেও ইঁহাদের সকলেই প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে এমন অবস্থায় পতিত হইবেন, যে অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাদের সকলেরই ঐরূপ নামকরণ করিয়াছি। কিন্তু নামটি কি আপনার মনোমত হয় নাই, প্রভু ?

নারায়ণ বলিলেন, নামে কিছু যায় আসে না, ভক্তবর। যাহাকে যে নামেই ডাকুন না কেন, সে প্রকৃতপক্ষে সে-ই থাকিয়া যায়। যেমন আমাকে যে কোন নামে ডাক দিলেই আমি আপন রূপে তাহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ অথবা পণ্ড করিয়া দেই। তবে, আপনার মতো অমিতশক্তিধর মুনিপুঙ্গব সেইসব কলিযুগবিহারীদের 'কাবু' আখ্যায় কেন ভূষিত করিলেন, তাহাই জানিবার বাসনা ছিল, এই মাত্র।

নারদ বলিলেন, হে নারায়ণ! এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, রাজা জনমেজয় সমীপে বৈশম্পায়ন-কথিত বাবুদলের মস্তকোপরি আরোহিত হইয়া যাঁহারা তাঁহাদের টেক্কা মারিয়া কাবু করিবেন এবং নিজেরা কাবু হইবেন, তাঁহারা অন্য যে নামেই নিজেদের পরিচয় দিন না কেন, আমি তাঁহাদের ঐ মহান্ 'কাবু' নাম ব্যতীত আর কোনও নামেই অভিহিত করিতে অভিলাষী নহি।

নারায়ণ কহিলেন, হে কলহাধীশ্বর মুনিপুঙ্গব! আপনার কাবুদল চিরকাল অক্ষয় কাবুত্ব লাভ করুন। এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে আমার নিদ্রা গভীর থেকে গভীরতর হউক। এইবার আপনি কাবুগণের মধ্যে আপনার প্রসাদ বিতরণোদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করুন। আমি অবিলম্বে বিশ্রাম সুরু করিতে আগ্রহী, দয়া করিয়া দেবী পদ্মালয়াকে এখানে পাঠাইয়া দিন।

মাতালের পাল্লায়

সেদিন রাত্রে একা একা সিনেমা দেখে ফিরছিলাম। গিয়েছিলাম 'ফাঁপর' দেখতে। কিন্তু নিজে যে এভাবে ফাঁপরে পড়ব, তা কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম ?

সদ্য-দেখা ছবির কাহিনীটা ভাবতে ভাবতে প্রায় হাতিবাগানের কাছাকাছি এসে পড়েছি, এমন সময় পড়ে গেলাম দুই রংদারের মাঝখানে। অর্থাৎ দিনের বেলায় কলকাতার গাড়ী-চলা পথ দেখে মনের জমা-রাখা হিংসাটাকে মোচন করার উদ্দেশ্যে এ হেন রাত্রি-গভীরে ট্রাম-লাইনের মাঝ বরাবর ধরে আসছিলাম। ওঁরা দুজনে ছিলেন যথাক্রমে দুপাশের দুটি ফুটপাথে। আমার আগে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে খিল খিল করে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলেন। ওঁরা তাঁদের কিছুই বললেন না। নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত।

আমি কিন্তু বেশ একটু দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, একজন বলছিলেন—'হাম্ এই ফুটপাথকা মন্ত্রী হায়। তুম্ কৌন্ হায় বে ?'. অপর ফুটপাথাধিকারী চিৎকার করে উত্তর দিচ্ছিলেন—'হাম্ এই রাজ্য কা রাজ্যিপাল হায়, তোম্ কো সে বেশী ক্ষ্যাম্‌তা রাখতা হায়। হান্ তো যখন-তখন তোম্‌কো তাড়িয়ে দেতে শেখতা হায়।' প্রথমজন তাঁর উত্তরটা 'তোন্ কো তো এই ফুটপাতমে কোই ক্ষ্যামতা'—পর্যন্ত অসমাপ্ত রেখেই হঠাৎ তাঁর এলাকা থেকে নেমে এসে রাস্তার মাঝ বরাবর আমাকে পাকড়াও করলেন, 'হে মশাই, এখানে দাঁড়াবার পাশপোর্ট করেছেন ?'

রাষ্ট্রভাষার ঝগড়া যে শেষ পর্যন্ত আমাকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক কর্তব্যের খাতিরে মাতৃভাষার অনুশীলনে এসে দাঁড়াবে, ভাবতে পারিনি। বললাম, 'দাঁড়াইনি তো, আমিতো চল্‌ছি।'

—'চলছেন মানে? আমরা কি বিশ্বের সাথে সমান তালে পা ফেলে ড্রিঙ্ক করতে পারছি? আমরা কি ভালভাবে আমাদের মাতৃভাষা ভুলতে পারছি?'

মাতালের সাথে কোন ব্যাপার নিয়ে ঠিক এখনই তর্কাতর্কি করবার ইচ্ছা হচ্ছিল না আমার 'ফাঁপর' ছবির মধুময় রসমাধুর্যে তখন ভরপুর হয়ে ছিল আমার চিন্তা। তাই আসল প্রসঙ্গ নিয়েই উত্তর দিলাম, 'সে চলা বলছি না, বলছি হাঁটার কথা, —ছেলেরা যাকে বলে হাঁটি হাঁটি পা পা। কিন্তু কর্পোরেশনের রাস্তায় হাঁটব তো পাশপোর্ট লাগবে কেন দাদা?'

এবার মোলায়েম কণ্ঠে বললেন দাদা, 'কে বললে এটা কর্পোরেশনের রাস্তা? সে ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলের আমলে। এখন এটা হচ্ছে আমার রাস্তা। আমিই এদিককার মুখ্যমন্ত্রী। যদি ভাল চান তো পাশপোর্ট বার করুন। ওসব দাদা-টাদা শুনতে চাইনা আমি।'

এবার কি বলব তাই ভাবতে যাচ্ছি, এমন সময় এগিয়ে এলেন বাঁ-পাশের ফুটপাথের রাজ্যিপাল। এসেই আমার দিকে চেয়ে একগাল হেসে বললেন, 'স্যার, আপনার কাছে কি পোস্ট-কার্ড আছে?'

আমার এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম যে, কোন কোন মাস-পয়লায় তাঁর গাড়ীতে এমন সওয়ার জুটে যায়, যিনি কলকাতায় উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে ট্যাক্সি চেপে ধাপায় গিয়ে থুতু ফেলে আসেন। সুতরাং মাতালের উদ্ভট খেয়ালের কথা যে আমার অজানা ছিল, তা নয়; তবু রাত সাড়ে বারোটার সময় পোষ্ট কার্ডের চাহিদা আমাকে যেন বিমূঢ় করে দিল। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এত রাতে পোষ্ট কার্ড কী করবেন আপনি?'

—'সে আপনি বুঝবেন না মশাই, এ ব্যাপারে অনেক নাউন-প্রোনাউন আছে। বেশ, যদি পোস্টকার্ড না থাকে তো না-ই রইলো,

তাড়াতাড়ি একটা বিড়ি বের করুন তো। একটা বিড়িতেই আমি আপনার পাশপোর্ট মঞ্জুর করে দেবো।'

ডানপাশের জন তেড়ে এলেন এবার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

—'তুই আমার সিটিজেনের পাশপোর্ট মঞ্জুর করবার কে রে? উনি কি তোর এলাকায় দাঁড়িয়েছেন? উনি তো আমার এলাকায় দাঁড়িয়ে। যা, যা ভাগ্।'

তারপর আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'মশাই, ওর কথা কানে নেবেন না। আপনার কাছে যদি কিছু ব্লটিং পেপার থাকে তো দিয়ে যান্, ওটাই আমি পাশপোর্ট বলে মেনে নেবো।'

খুব মুস্কিলে পড়লাম। একে আমি ধূমপান বিরহিত হওয়ায় পকেট বিড়িশূন্য, তার ওপর এত রাত্রে সিনেমা দেখে ফিরতি পথে পোষ্ট-কার্ড বা ব্লটিং পেপারই বা পাব কোথায়? অথচ এঁদের দুজনের সাথেই দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারেও যথেষ্ট উৎসাহিত হতে পারছিলাম না আমি। বলা বাহুল্য, ওঁদের যে কোন একজনের সাথে নিজেকে তুলনা করতে গিয়ে, কেন জানি না, বারে বারে ধুনুরী আর পেঁজা-তুলোর কথাটাই মনে পড়ছিল আমার।

তাই একটু বিনয়াবনতের ভঙ্গীমায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু ব্লটিং পেপার দিয়ে আপনি কি করবেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলেন তিনি, 'আরে, সে দুঃখের কথা আর বলবেন না ভাই। শালকে থেকে কলকাতায় এই জল খেতে আসতে রোজই ষ্টিমারে আমার কুড়ি পয়সা বেরিয়ে যায়। তাছাড়া ঐ শা - চণ্ডীশুঁড়ী আমাদের মা কালীর পেসাদের সঙ্গে মা গঙ্গার চরণামৃত ঢেলে দিয়ে নেশাটাকে আর তেমন জমতে দেয় না। তাই ভেবেছি, ব্লটিং পেপার দিয়ে গোটা গঙ্গাটাকে শুষে ফেলে তবে ছাড়ব। আমার রোজ কুড়িটা করে পয়সাও বাঁচবে, আমার চণ্ডীশুঁড়ীও জব্দ হবে। কেমন দাদা, আমার বুদ্ধিটা খুব জুতসই কিনা?

বুদ্ধিটা যে খুব জুতসই তা আর আমাকে বলতে হলো না। বাঁ পাশের জনই তারিফ করে বলে উঠলেন, 'তুই ঠিক বলেছিস্ ভাই মূর্খ-মন্ত্রী। ঐ শা— চণ্ডীশুঁড়ীকে যদি জব্দ করতে পারিস তো আমি শিবের মতো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ব, আর তুই আমার বুকের ওপর মা কালীর মতো জিব বার করে যতদিন পারিস দাঁড়িয়ে থাকবি, আমি কিচ্ছু বলব না।'

এবার আনন্দের সঙ্গেই ভারিক্কি চালে বলে উঠলেন বুদ্ধিমান মাতালটি, 'হেঁ হেঁ, তাই বল্। কিন্তু তুই এঁনার কাছে পোষ্ট-কার্ড নিয়ে কি করবি?'

যথেষ্ট লজ্জান্বিত ভাবেই যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতেই বলে উঠলেন দ্বিতীয় জন, 'সে আর বলিস্‌নি ভাই, বড্ড ঘামাচি হয়েছে পিঠে, চুলকোবো।'

হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হাসলাম না। হাসির বিপদ অনেক। তাছাড়া এঁদের পাল্লায় পড়ে গোটা রাতটাকে খোয়াতে চাইছিল না আমার মন। 'ফাঁপর' দেখতে গিয়ে আচ্ছা ফাঁপরেই পড়লাম দেখছি আজ!

ডান-পাশ এবার আমাকে প্রশ্ন করে উঠলেন, 'মশাই, আপনি কোন্ বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলেন?'

উত্তর দিতে হলো। শুনে তিনি 'ছি ছি' করে উঠলেন, এবং অপরজন বলে উঠলেন, 'ঐ নক্কার ছবিটা আপনি দেখতে গেছলেন? ঐ ছবিটা কি দেখবার হলো? গত বছরের আগের বছরের আগের বছর ঐ ছবির কাহিনীটাই তো উপন্যাস হয়ে 'উপহাস' পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল, তাই না?'

মাতালের স্মৃতি আমাকে বিমুগ্ধ করল।

তিনি বলে চললেন, 'তারপর ঐ উপন্যাসটাই তো অশ্লীলতার অভিযোগে কারাদণ্ড ভোগ করেছিল, তাই না?'

এবার আমার বিগলিত হবার মতো অবস্থা।

তিনি তখনও বলে চলেছেন, 'তা বেশ হয়েছে। ঐরকম একটা খোলাখুলি মেয়েমানুষ আর বেটাছেলের যাচ্ছেতাই কাণ্ডমার্কা উপন্যাস কারাদণ্ড ভোগ করেছিল, ভালই হয়েছিল। কিন্তু ওটা যখন বায়স্কোপ হয়ে এলো, তখন কি ওটাকে না দেখালেই হতো না? ঐরকম খারাপ ব্যাপার পড়লেও যে পাপ। দেখালেও তো সেই পাপ; নয় কি?'

পাপ সম্পর্কে ঋষিতুল্য মহাজ্ঞানী এই পথের মাতালটি আমাকে এবার বিচলিত করল। না ব'লে থাকতে পারলাম না, 'পাপ আবার কি মশাই? আমাদের ধর্মগ্রন্থে তো এরকম বহু অশ্লীল ব্যাপার লেখা আছে। সেগুলো পড়লে কি তবে আমাদের পাপ হয়, বলতে চান?'

প্রশ্নটা বাঁ পাশকে করলাম, কিন্তু উত্তর দিলেন ডান-পাশ, 'ধম্মোগ্রন্থ মানে? কোন্ ধম্মোগ্রন্থ?'

এরও উত্তর আমাকে দিতে হলো না। দিলেন বাঁ-পাশ, 'কেন, 'ফাঁপরে'র সাপোর্টাররাই কি বলেনি যে রামায়ণে নাকি ওর চেয়েও খারাপ খারাপ ব্যাপারের কথা লেখা আছে? বলুন তো মশাই, কথাটা কি সত্যি?'

আমার যতদূর মনে ছিল, রামায়ণে এক বা দু' জায়গায় বিশেষ প্রয়োজনে (বোধ হয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই) আদিকবি একটু অশ্লীলতার দায়ে হয়ত অভিযুক্ত হতে পারার মতো বর্ণনা দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তবুও সে বর্ণনা তো 'ফাঁপর'-এর বর্ণনার তুলনায় বিরাট মরুভূমিতে একখণ্ড বালির মতো। তাছাড়া রত্নাকর মশাই যাঁদের প্রসঙ্গে ঐ বর্ণনা করেছিলেন বলে মনে হয়েছিল, তাঁদের প্রসঙ্গে ঐরকম কথা ভাবাটা বোধ হয় অতিরিক্ত ছিল না। কিন্তু 'ফাঁপর'-এর লেখক যে নিজেকে সহ আমাদের সকলকেই সেই পর্যায়ভুক্ত বলে ধরে নিয়ে অশ্লীল করে ছেড়েছেন, সে কথাটা এখন বোঝাই কাকে, আর বুঝবে কে? বিশেষ করে নিজেই যখন সেই 'ফাঁপর' দেখে ফিরছি? তবে এসবের কোন কথাই এখানে

ফাঁস করতে ভরসা পেলাম না আমি। কারণ এঁরা সত্যি সত্যি 'ফাঁপর'-এরই দলে, না রামায়ণের দলে, তা-ও বোঝা আমার সাধ্য কি? এঁদের মতো চণ্ডীশুঁড়ীর দরজায় যেতে পারলে হয়ত মীমাংসা করতে পারতাম। কিন্তু কথাটা ভাবতেই যেন মনে হলো, 'ফাঁপর' নয়, আমারই কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে গেছে।

সহসা 'ফাঁপর'ই আমাকে ফাঁপর থেকে উদ্ধার করে দিল। চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ড়ু'জনের উদ্দেশ্যেই চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'আচ্ছা', রামায়ণ রচয়িতা কালিদাসের মতো মহাভারত রচয়িতা ভবভূতিও তো ক্রিষ্টিন কীলারের কেলেঙ্কারার চেয়েও অনেক মারাত্মক মারাত্মক ব্যাপার লিখে ফেলেছে। এসব কেন তারা লিখল, একটু তর্কাতর্কি করলেই কি তা বের করা যায় না?'

ওঁরা যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন আমার কথা শুনে। কিন্তু যে নেশায় তাঁরা মশ্‌গুল, সে নেশার চেয়ে আমার কথার নেশা ওঁদের কাবু করতে পারল না একটুও বেশী। ওঁরা ড়ু'জনেই একসঙ্গে বেশ ভারিক্কি চালে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, কিন্তু তা কি করে হয়?'

আমিও দমবার পাত্র নই। বিশেষ করে এ হেন বেদম ব্যাপারে কথার খেই হারিয়ে অবদমিত হয়ে জীবনের দম হারিয়ে দমাদম খেতে পাবার আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠেছিল চিত্তে। তাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়েই বলে গেলাম, 'কেন, একেবারে সামনা-সামনি ড়ু'জনকে ধরে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়, দেখবেন, তাহলেই সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, আমাদের পাপের বোঝাও হাল্কা হয়ে যাবে।'

আমার চালে ওঁরাও মোহিত হলেন। আমার এই মহাকবিদের নাম পাল্টে-দেওয়াটা আধুনিক অশ্লীল-লেখক বা শ্লীলতাপ্রিয় সমালোচকদের মতো সেই মহাস্মৃতিবান্ মাতাল-পণ্ডিতদেরও স্মৃতিকে হার মানালো। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে তাঁদের পাব? তাঁরা কি বেঁচে আছেন?'

আমি বললাম, 'কেন, আপনারা একজন কালিদাস, আর একজন ভবভূতি হলেই তো সব গোলমাল মিটে যায়!'

মাতাল হলেও আমার এই 'সাজেসান'টা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পারলেন, এবং তখনই নিজেদের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন, কে ভবভূতি, আর কে কালিদাস। তারপর সেইখানেই, সেই রাস্তার লাইনের ওপরেই, আপনাপন মহাকাব্যের মীমাংসা করতে বসে গেলেন প্রাচীন ভারতের দুই প্রাতঃস্মরণীয় মহাকবি। এবার কেবলমাত্র পোস্টকার্ড অথবা ব্লটিং পেপারের জন্য আদৌ তাঁরা আর লালায়িত নন; রীতিমত শ্লীলতা-অশ্লীলতার গুরুগম্ভীর-তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ দুই অভিধান-বহির্ভূত শব্দ-চয়নকারী মহাতার্কিক।

শ্লীলতার পক্ষে ওঁদের ভাষা যে স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিনী তটিনীর মতোই মহাবেগে অশ্লীলতার সমুদ্রে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তা ওঁরা বুঝতে পারলেন না একটুও। তবে এ কথা স্বীকার না করলে কৃতঘ্নতার অপরাধে অপরাধী হবো যে, ক্ষুরধারসম সুতীক্ষ্ণ বহু-বিচিত্র উদাহরণ এবং যুক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওঁরা দুজনেই প্রমাণ করে দেবেন যে, যুগের পক্ষে সব-কিছুই স্বাভাবিক এবং অনিন্দনীয়। শেষ পর্যন্ত হয়ত তাঁরা এই রায়ও দেবেন যে, যারা যুগের কথা ভুলে গিয়ে সেই এক ঘেয়ে সনাতন-ধারার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও প্রীতি নিয়ে বসে আছে, তারা 'চণ্ডীশুঁড়ী'র চেয়েও মারাত্মক। তারা নিপাত যাক্, এবং যুগের দাবি জিন্দাবাদ্।

অবশ্য যুগ বলতে তাঁরা যে কোন্‌টাকে বোঝাতে চাইলেন, তা বুঝতে পারা আমার মতো অ-মাতালের পক্ষে অসম্ভব নয়। চির-কালের মতো সর্বকালেই 'বর্তমান'কে মর্তমান খাওয়াবার উদ্দেশ্যেই 'কলিযুগ', এবং 'অতীত'কে ভীতি দেখাবার জন্যই 'সত্যযুগ' বলে চালিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ কখনও ধ্বংস হবে না,—এর কোনও শেষ নেই। কিন্তু সে কথা থাক্।

যে 'ফাঁপর' আমাকে ফাঁপরে ফেলেছিল, সেই 'ফাঁপর'ই আমাকে ফাঁপরমুক্ত করল। সুযোগ বুঝে অতি সতর্কতার সঙ্গেই দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম আমি বাড়ীর দিকে।

আমার এই সতর্কতা অনেকটা নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে নিঃশব্দে পাঁপড় খাওয়ার চেষ্টার মতোই হয়েছিল কিনা, মনে নেই।

অগ্রিম চিঠি

প্রিয় পাঠক/সহৃদয়া পাঠিকা,

আপনারা যে আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করেও এইরকম একটা বাজে বই পড়েছেন, তার জন্য আমি সত্যই কৃতার্থ। অবশ্য সাহিত্যে যে কোনদিন খুব কাজের বই প্রকাশ হয়েছে, এমন কথা বলছি না। কারণ কাজের বই লিখতে গেলে ছাত্রদের জন্য 'নোট' বই লিখতে হয়, এবং তাতে যে পকেটের দিকটাও কাজের হয়ে ওঠে, তা স্বীকার করছি। এই বইটা সাহিত্য হয়ে না উঠলেও কাজের বই অবশ্যই হয়নি।

এ হেন অ-কাজের বই-টই পড়া অভ্যাস আছে বলেই আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, এর মধ্যে তুটি গল্প ছাড়া বাকী দশটি গল্পই 'নব-কল্লোল,' 'ঘরোয়া', 'আসর', 'সচিত্র ভারত', 'অচল-পত্র' ইত্যাদি পত্রিকাওয়ালারা ইতিমধ্যেই একবার করে ছেপেছিলেন। সুতরাং এ কথাটাও জেনে রাখলে আপনার ক্ষতি নেই যে বাকী 'বীরেন্দ্র চরিতম্' ও 'মাতালের পাল্লায়' গল্পতুটি শেষপর্যন্ত ম্যাটার কম পড়ে যাওয়ায় রাতারাতি লিখে প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং এই তুটি মাত্র গল্প থেকে আমার প্রাপ্য গালাগালি পাবার সৌভাগ্য আমি এখনও পাইনি।

ছাপায় প্রচুর ভুল আছেই; সংশোধনের উপায় নেই। কারণ প্রকাশকমশাই একসঙ্গে এত বেশী কাগজ নষ্ট করেছেন যে, আমার জীবদ্দশায় এর দ্বিতীয় সংস্করণ দেখবার আশা নেই। তা না থাক, আপনারা নিজেরাই বইয়েতে কেটেকুটে ঠিক করে নেবেন, এটা প্রার্থনা করি।

সামনে থাকলে আপনার পায়ের ধূলো নিতাম। দূর থেকে হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছি। ইতি;

অতীতের কাগজশত্রু

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়